



মাসিক

আলোকধারা

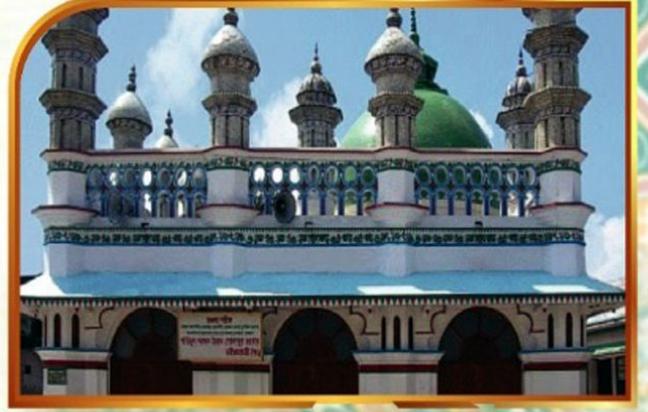
তাসাওউফ বিষয়ে বহুমুখী গবেষণা ও বিশ্লেষণমূলক জার্নাল

রেজিঃ নং চ-২৭২

২৫তম বর্ষ

দশম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২২ ঈসাহী





আমেরিকার বোস্টনস্থ 'মাইজভাগরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, নিউ ইংল্যান্ড শাখা'র আয়োজনে ম্যাসাচুসেটসের ওয়াটার টাউনের হিবারনিয়ান হলে অনুষ্ঠিত "পবিত্র শোহাদা-ই-কারবাল" মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন গাউসিয়া হক মন্ডলের সম্মানিত সাজ্জাদানশীন ও 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগরী (ক.) ট্রাস্ট (এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট)'-এর ম্যানেজিং ট্রাস্টি হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাগরী (ম.)। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক নর্থ ব্রংক ইসলামিক সেন্টারের খতীব ও পরিচালক বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ও গবেষক শাইখ সাইফুল আযম আজহারী। প্রধান অতিথিকে সাইটেশন প্রদান করেন প্রজেক্ট হোপ ফর সাউথইস্ট এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. হাই ভ্যান হা এবং সম্মাননা ক্রেস্ট তুলে দেন সংগঠনের সভাপতি কাজী আবসার উদ্দিন।



চট্টগ্রাম কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতালকে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগরী (ক.) ট্রাস্ট-এর অনুদান প্রদান

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগরী (ক.) ট্রাস্ট-এর উদ্যোগে 'এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট' বৃত্তি তহবিল'কে এবং শিক্ষা ও বিভিন্ন খাতে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ)'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম. জহিরুল আলম দোভাষ, সিডিএ'র বোর্ড সদস্য এবং কারা পরিদর্শক এডভোকেট জিনাত সোহানা চৌধুরী এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।



গত ২১ জুলাই ২০২২ খ্রি. কাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগরী (ক.) ট্রাস্ট পরিচালিত 'দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প (যাকাত তহবিল)'র ব্যবস্থাপনায় চন্দনাইশ উপজেলাধীন দোহাজারী খান গ্লাজায় সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিতে ১১তম দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র 'হযরত সৈয়দ জালাল উদ্দিন বোখারী (রঃ) দাতব্য চিকিৎসালয়'র কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম চৌধুরী এম.পি (চট্টগ্রাম-১৪), চন্দনাইশ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাসরিন আকতার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসাইন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ফটিকছড়ি উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভাধীন দৌলতপুর ৫নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী হযরত দৌলত দিঘীর পাড় আউলিয়া (রহ.)'র মাজার পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগরী (ক.) ট্রাস্ট'-এর পক্ষে চেক হস্তান্তর করছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি হালদা ফ্রপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সরোয়ার আলমগীর।



আলোকধারা

THE ALOKDHARA
A MONTHLY JOURNAL OF
TASAWWUF STUDIES

রেজি. নং চ ২৭২, ২৮তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী
রবিউল আউয়াল-রবিউস সানি ১৪৪৪ হিজরী
আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৯ বাংলা

প্রকাশক

গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জরীর পবিত্র রক্ত ও
তুরিকতের উত্তরাধিকার সূত্রে এবং অছিয়ে গাউসুল
আযম মাইজভাঞ্জরী প্রদত্ত দলিলমূলে, গাউসুল আযম
মাইজভাঞ্জরীর রওজা শরিফের খেদমতের হকদার,
তাঁর স্মৃতি বিজড়িত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের হকদার,
শাহী ময়দান ব্যবস্থাপনার হকদার-
মাইজভাঞ্জর শরিফ গাউসিয়া হক মন্জিলের
সাজ্জাদানশীন
সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সম্পাদক

অধ্যাপক জহুর উল আলম

যোগাযোগ:

০১৭৫১ ৭৪০১০৬

০১৩১০ ৭৯৩৩৩২

মূল্য : ২০ টাকা \$=২

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স
সৈয়দ সলিমুল্লাহ শাহ রোড, বিবিরহাট
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম-৪২১১।
ফোন: ০২৩৩৪৪৫৪৩২৬-৭



এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট-এর পক্ষে
মাইজভাঞ্জরী একাডেমি প্রকাশনা

www.sufimaizbhandari.org.bd
E-mail:sufialokdhara@gmail.com

সূচী

- সম্পাদকীয় ----- ২
- কারবালার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে যুগের প্রয়োজনে ফিকাহ সিস্টেম পুনর্বিদ্যাস করে মুসলিম উম্মাহকে তার দায়িত্ব পালনে সুযোগ করে দিন - হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাঞ্জরী (বার্তা পরিবেশক) ----- ৩
- বিশ্বনবী (দ.)'র বিশ্বদর্শনকে খণ্ডিতভাবে নয়, সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে দার্শনিক চিন্তাধারার স্ক্রুণ ঘটাতে হবে - হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাঞ্জরী (বার্তা পরিবেশক) ----- ৯
- চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত ৩৭ তম আন্তর্জাতিক শোহাদায়ে কারবালা মাহুফিলে রাহুবারে আলম হযরত শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাঞ্জরী (ম.)'র বাণী ----- ১৩
- বেলায়তে মোতলাকা (নবম পরিচ্ছেদ) খাদেমুল ফোক্বারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাঞ্জরী (ক.) আক্লে কুল্লি বা কুদসি সুনৈতুত ও ধর্মসাম্য বেলায়তে মুহিত ----- ১৫
- “পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: পরম ভাবমর্যাদা এবং শ্রদ্ধায় বিশ্বনবী (দ.) কে স্মরণ” দেশ জয় নয়: আদর্শের বিজয়ের অনুপম উপমা মক্কা বিজয় আলোকধারা প্রতিবেদন ----- ১৭
- উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.) মোহাম্মদ গোলাম রসুল ----- ২১
- আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ অধ্যাপক জহুর উল আলম ----- ২৩
- নীরবতা এবং বাবাজান কেবলা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাঞ্জরী (ক.) মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন ----- ৩৫
- শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঞ্জরী (ক.)'র জীবনাদর্শে তাসাওউফ ও হক্কুল ইবাদের প্রাসঙ্গিকতা: মুহাম্মদ ওহীদুল আলম ----- ৩৭
- মা'জান, উম্মুল আশেকীন এ ওয়াই এমডি জাফর ----- ৪১
- সাহাবায়ে কেরাম (রা.)'র মর্যাদা এবং অবস্থান প্রসঙ্গ আলোকধারা ডেস্ক ----- ৪৪
- “তারিখে তাসাওউফে ইসলাম” গ্রন্থে তাওহিদে আদইয়ান বিষয়ক আলোচনা ----- ৪৫
- মাহুবুবে ইলাহী হযরত নিয়ামুদ্দিন আউলিয়া'র খুত্বা সংকলন: গ্রন্থনা: হযরত আমীর উলা সাজ্জরী (রহ.) অনুবাদ: কফিল উদ্দিন আহমদ চিশতী ----- ৪৭
- ‘আয়নায়ে বারী’ কিতাবের ভাবার্থ এস এম এম সেলিম উল্লাহ ----- ৫০
- একুশ শতকে মুসলিম উম্মাহর চ্যালেঞ্জ: প্রেক্ষাপট, সমস্যা এবং সমাধান জাবেদ বিন আলম ----- ৫১
- শিশুতোষ: “মায়ের নির্দেশ: মিথ্যা বলবে না” ফারহানা আকতার চৌধুরী ----- ৫৯

সম্পাদকীয়

আল্লাহর অশেষ রহমতে মাসিক আলোকধারা অক্টোবর ২০২২ সংখ্যা প্রকাশিত হলো, আলহামদুলিল্লাহ! সৌভাগ্যের বিষয় হচ্ছে এ সংখ্যা প্রকাশ-সময়ে চলমান রয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র আবির্ভাবের হিজরী মাস মহান রবিউল আউয়াল। এটি বিশ্ব স্বীকৃত বিষয় যে, মানব আকৃতিধারী আল্লাহ প্রেরিত পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (দ.) সমগ্র সৃষ্টির জন্যে রহমত এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহর অনুপম অসীম কর্ম সৌন্দর্যের প্রকাশ হিসেবে আবির্ভূত। তিনি আখেরী নবী, সকল নবী এবং তাঁদের নিকট প্রেরিত আসমানী গ্রন্থ এবং সহীফাসমূহের সত্যায়নকারী, তিনি নবুয়তের সীল মোহর। তিনি স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী এবং নৈকট্য অর্জনের পথ নির্দেশক। তাঁর পর আর কোন নবী পৃথিবীতে আসবেন না। তাই তিনি ইহজাগতিক ব্যবস্থাপনা, জীবনাচার এবং পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে ঐশী নিয়মের সর্বোত্তম প্রবর্তক। অলৌকিকতা এবং বাস্তবতার যুগপৎ সমন্বয় ঘটেছে তাঁর পবিত্র জীবনাচারে। ধর্ম শুধু ভাবের সর্বোচ্চ মোকামে উত্তরণের বিষয় নয় বরং পৃথিবীর বুকে সংক্ষিপ্ত জীবনাতিপাতের সময় উত্তম কর্ম উদ্দীপনার প্রাণবন্ত বিষয়ও বটে। মহান আল্লাহর প্রতি পরম আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে ছন্দ-কর্মময় জীবনে সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা, শান্তি এবং সম্প্রীতি ও পারস্পরিক আস্থার নিকুঞ্জ গড়ে তুলে পরকালে অভিযাত্রার জন্য পরিপূর্ণ খতিয়ান তৈরী করার নাম ধার্মিকতা। তাই ধর্মে সততা আছে, শঠতা নেই। প্রণোদনা আছে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা নেই। অঙ্গীকার আছে, অঙ্গীকার লঙ্ঘন নেই। কারণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বময় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। আল্লাহর দরবারকে যখন আমরা সর্বত্র-সর্বক্ষণ কর্মমুখর, স্থিত এবং বিদ্যমান বলে বিশ্বাস করি তখন এটি নিশ্চিত বলা সঙ্গত যে, পার্থিব সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। তাই সৃষ্টিকুলের কর্মের জবাবদিহিতা তাঁরই অন্তর্ভুক্ত। মানুষ ব্যতীত অন্য সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহর খলিফা হিসেবে মর্যাদাভুক্ত হয়নি, সেহেতু মানুষের জন্যই আল্লাহ নির্দেশ করেছেন দায়িত্ব, কর্তব্য এবং জবাবদিহিতার আঙ্গিনা। এই আঙ্গিনার নাম পার্থিব জীবন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) হক্কুল্লাহ এবং হক্কুল ইবাদের মাধ্যমে পার্থিব জীবনে মানুষের জীবনাচার সম্পর্কে প্রান্তিক ধারণা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই জন্যেই তিনি আল্লাহ প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মানব-ইনসানে কামিল। তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণে রয়েছে মানবজাতির সার্বিক মুক্তি। মহান আল্লাহর সৃষ্টি ফেরেশতাদের নির্ভুল-নিষ্কলুষ জীবনাচার উর্ধ্বাকাশে নির্ধারিত। পরম পবিত্রতার পরশে উজ্জীবিত ফেরেশতা জগত থেকে শয়তান বিতাড়িত। তাই ওহীর জগতে শয়তানের কোন প্রকার অবস্থান নেই। কিন্তু মানুষ, যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণের জন্যে, সেখানে রয়েছে শয়তানের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। এ ধরনের নিবাসগত পার্থক্যের মধ্যে দেখা যায়, ফেরেশতা

জগতে কোন প্রকার ভুল-বিচ্যুতি নেই। অন্যদিকে পৃথিবীতে শয়তানের কোন ভুল নেই। কারণ শয়তানের কাজ হচ্ছে মানুষকে সর্বাবস্থায় প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত রেখে ইবলিসি খাসলতকে অব্যাহত রাখা। অর্থাৎ সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি অপকর্মের প্রধান শক্তি শয়তান। এটি মহান স্রষ্টার এক অনন্য রহস্য। এ কারণে পৃথিবীতে মানুষের অবস্থান দ্বন্দ্বিক। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর খলিফার মর্যাদা নিয়েই আগমন করেছে। অন্যদিকে শয়তান মানুষের এই মহান মর্যাদাকে ধূলিস্যাতে সর্বদাই লিপ্ত রয়েছে। একদিকে মানব অন্তরে রয়েছে ঐশী অনুপ্রেরণা এবং দীপ্তি, অন্যদিকে শয়তানের প্ররোচনা, প্রবঞ্চনার টানাটানি। এ ধরনের দ্বন্দ্ব ঐশী অনুপ্রেরণাকে সদাজগ্ৰত রাখার লক্ষ্যে অবিরাম চেষ্টা সংগ্রাম পরিচালনার ধারাকে বলা হচ্ছে তাসাওউফ জগত। প্রত্যেক নবী-রাসুল যুগে যুগে পৃথিবীর বুকে মানবজাতির জন্যে বিশুদ্ধ পথ নির্দেশক হিসেবে এই ধারাকেই জগ্ৰত করেছেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এ ধারার আলোকেই সদা কল্যাণময় পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন জাগৃতি। অর্থাৎ পৃথিবীতে কল্যাণময় জীবনাচারে রয়েছে পরকালীন কল্যাণ। ইসলাম প্রকৃত অর্থে পার্থিব-কর্মের সঙ্গে পারলৌকিক প্রাপ্তির সংযোগ স্থাপনকারী ধর্ম। এ ধর্মের কর্মবাণীই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) পৃথিবীবাসীর জন্যে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এবারের আলোকধারার 'সাধারণ ক্ষমা' বিশেষ প্রতিবেদন জগতবাসীর জন্যে বিশ্বনবী (দ.)'র শিক্ষা হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছে। আলোকধারা অক্টোবর ২০২২ সংখ্যায় হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলা আলমের খোশরোজ শরিফ উপলক্ষ্যে মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন-এর নিজস্ব চিন্তার আলোকে রচিত 'নিরবতা এবং বাবাজান কেবলা (ক.)' ছাপানো হয়েছে। ২৬ আশ্বিন বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র উরস শরিফ উপলক্ষ্যে সুলেখক, গবেষক মুহাম্মদ ওহীদুল আলম-এর লিখা প্রবন্ধ 'শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.): হক্কুল ইবাদের প্রসঙ্গিকতা' প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংখ্যায় শাহানশাহ কেবলায় আলমের মহীয়সী সহধর্মিনী হযরত মুনাওয়ারা বেগম মাইজভাণ্ডারী (রহ.)'র স্মরণে অধ্যাপক এ ওয়াই এমডি জাফর রচিত স্মৃতিচারণমূলক নিবন্ধ "মা'জান, উম্মুল আশেকীন" ছাপিয়ে শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়েছে। এ ছাড়া নিয়মিত পরিবেশনা হিসেবে রয়েছে, উম্মুল মু'মিনীন (রা.)'র জীবন, আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র তাসাওউফ জগত: হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.), মাহবুবে ইলাহী হযরত নিয়ামুদ্দিন আউলিয়ার খুত্বা সংকলন, শোহাদায়ে কারবালা উপলক্ষ্যে মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র বাণী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শোহাদায়ে কারবালা অনুষ্ঠানে মওলা হুজুর মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র ভাষণ, একুশ শতকে মুসলিম উম্মাহর চ্যালেঞ্জ, আয়নায়ে বারী'র অনুবাদ, শিশুতোষ এবং সাহাবাদের মর্যাদা এবং তাওহীদে আদইয়ান সম্পর্কে 'তারিখে তাসাওউফে ইসলাম' গ্রন্থের আলোচনা প্রভৃতি। আল্লাহ আমাদের সকলের কল্যাণ করুন। আমিন।

কারবালার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে যুগের প্রয়োজনে ফিকাহ্ সিস্টেম পুনর্বিদ্যায় করে মুসলিম উম্মাহকে তার দায়িত্ব পালনে সুযোগ করে দিন- হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (বার্তা পরিবেশক)

মাইজভাণ্ডারী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, নিউ ইংল্যান্ড শাখা কর্তৃক আয়োজিত শাহাদাতে কারবালা মাহ্ফিলে রাহ্বারে আলম শাহ সুফি হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.) উপর্যুক্ত মন্তব্য করেন। অতঃপর তিনি ভাষণে বলেন,

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াল আক্বিবাতু লিল মুত্তাক্বিন, ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সায্যিদিল মুরসালিন। ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাদ্বিন। আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজিম। বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

ওয়াল তাহসাবান্নাল লাযিনা কুতিলু ফি সাবিলিল্লাহি আম ওয়াতান, বাল আহুইয়ায়ুন ইনদা রাব্বিহিম ইউরযাকুন (সূরা আলে ইমরান-১৬৯)। সাদাকালাহুল মাওলানাল আজিম। ওয়া সাদাকা রাসুলুহুন নবীউল কারীম, ওয়ানাহনু আলা যালিকা মিনাশ শাহিদিনা ওয়াশ শাকিরিন। মাওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম দায়িম্যান আবাদান আলা হাবিবিকা খাইরি খালকি কুল্লিহিম।

Maizbhandari Gausia Huq committee Bangladesh New England Branch USA is Organized this program. Dear honorable president of the program, Main speaker of the program and other Distinguished Guests who are sitting in the stage and in front of us and Ladies and Gentlemen, Our kids Assalamualikum warahmatullahi wa rahmatullahi wabarakatuhu. I am Glad that I have been able to join you in this holy program. Commemorating, Remembering the Sacrifice in the Virtues of the Shuhada- E- keram of karbala who have from Ahle Baite Rasul and also from the Asheke Ahle Baite Rasul. To Express Myself conveniently I would like to delivered the rest of my speech in Bangla. So that I can clarify my points without any doubts and Shadow of doubts. And for that reason as always I seek permission from our sheikh.

Would you kind permission I would like to proceed.

আমরা যেহেতু এখানে বাংলা ভাষাভাষি সবাই আছি। আমি বাংলায় কথা বলতে সাচ্ছন্দবোধ করব, নিজেকে বোঝাতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করব। তাই আমার ভাষাগত দুর্বলতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। বিশেষ করে আমরা বিশেষ একটা Time and place এর মধ্যে অবস্থান করছি। শায়খ সাইফুল আযম আযহারী সাহেব বলেছেন। Actually বিশেষ করে আপনারা একটা Time and place এ অবস্থান করছেন, যেটা ইউনিক। আমরা বাংলাদেশে এক ধরনের অবস্থায় থাকি, আপনারা Completely Different একটা অবস্থায় আছেন এবং আমরা সবাই মিলে অন্য রকম একটা টাইমের মধ্যে আছি। টাইমের ক্ষেত্রে আমরা Common, Place এর ক্ষেত্রে আমরা ভিন্ন। আপনারা যেহেতু Mostly ইউ.এস.এ থাকেন, বিশেষ করে Young Generation যারা আছেন এবং আমাদের মা বোনেরা যারা আছেন, এমনকি এখানে যারা উপস্থিত আছেন অনেকের হয়তো কিছু জিনিস একটু জানা দরকার। যদিও বিষয়টা সরাসরিভাবে আজকের এই মাহ্ফিলের সাথে হয়তো যুক্ত নয়, কিন্তু যেহেতু আমি এসেছি, তাই আমি নিজেই একটু Introduce করতে চাই যে, Who am I? Where I'm From? এটি একটু বলতে চাই। এটুকু বলতে চাই যে, আমি একজন খাদেম। দ্বীনি খেদমতের অংশ হিসেবে একটি Islami spiritual Philosophical Reformed Movement, যেটাকে আমরা Popularly মাইজভাণ্ডারীয়া তুরিকা বলি। আমি আমার দ্বীনি খেদমতের অংশ হিসাবে এই মিশনের সাথে, এই Spiritual Philosophical Reformed Movement এর সাথে খাদেম হিসেবে নিজেই যুক্ত রেখেছি। এই তুরিকা অথবা Way to Allah প্রায় দুইশো বছরের একটা ঐতিহ্য। বৃটিশ আমলের শেষ সময়ে একজন আল্লাহর মহান অলি এই ঐতিহ্যের সূচনা করেন।

যেহেতু এটি একটি সুফি School of thought, সুফি পরিভাষায় উনার যে অবস্থান, মর্যাদা, সম্মান, সেটি বুঝানোর জন্যে আমরা জেনেছি যে, আমাদের মুরক্বিবগণ, যাঁরা অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ তাঁরা উনাকে 'গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী' নামে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'হযরত শাহ

সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাঞ্জরী কেবলা কাবা' এই ঐতিহ্যের সূচনা করেন। উনি এই ঐতিহ্যের, এই দর্শনের, এই আধ্যাত্মিক, দার্শনিক এবং সংস্কারমূলক যে কর্মসূচি, সে কর্মসূচির রূপরেখা উনার জীবনের ভেতর দিয়ে উনার Diciples-দেরকে প্র্যাগ্টিস করিয়ে যান এবং তাঁর Diciples-দের মাধ্যমে এটি পুরো বাংলাদেশে আজকে Generation After Generation একটি গুরুত্বপূর্ণ Movement হিসেবে, Current হিসেবে, একটি ধারা হিসেবে পরিগণিত এবং নানান পর্যায়ে, নানানভাবে খেদমত করে চলেছেন। আমি কোথেকে এসেছি এটি আপনাদেরকে বলা প্রয়োজন। এটি বলেই আমরা আজকের যে মূল টপিক সে টপিকে চলে যাব।

মাইজভাঞ্জরীয়া তুরিকা, যেটি চট্টগ্রাম থেকে ইনিশিয়েটেড হয়েছে, All Over The World এটি Spread হয়েছে। এবং অগণিত মানব সন্তান, আদম সন্তান আল্লাহ্-আল্লাহ্ রাসুলের সম্ভৃষ্টি অর্জনের জন্য এই তুরিকার সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন যুগে যুগে, এখনো আছে। এই তুরিকার বৈশিষ্ট্যগুলো আমি শুধুমাত্র বলছি। আদর্শগত জায়গাগুলো থেকে আমি খাদেম, আর রক্তগতভাবে-যিনি এই তুরিকার ফাউন্ডার, সেই ফাউন্ডারের আমি হচ্ছি ডিসেন্ডেন্ট তথা অধঃস্তন পুরুষ। আমার পিতাকে এই জগতে আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামিন 'শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাঞ্জরী' নামে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ 'শাহগণের শাহ্'। আল্লাহর যাঁরা পেয়ারা বান্দা তাঁদেরকে আমরা সম্মান করে 'শাহ্' বলি, আর তাদের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক পদাধিকারী ব্যক্তিত্ব উনাকে 'শাহানশাহ্' বলে এই দুনিয়ায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন মশহুর করেছেন। আমি আমার ক্ষুদ্রতা নিয়ে, আমার সীমাবদ্ধতা নিয়ে নানান ভুলক্রটি নিয়ে খেদমত করার চেষ্টা করছি। যাতে মানুষ উপকৃত হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি যে, এই তুরিকার দর্শন, আদর্শ, শিক্ষা, নীতিমালা যুগোপযোগী এবং ভবিষ্যতমুখী। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে এই যে ট্রানজেকশন, একটি দিক থেকে আরেক দিকে যাচ্ছে। আমরা শিল্প বিপ্লব থেকে Space age এর দিকে যাচ্ছি বা চলে আসছি বা আরও Artificial intelligence age এর দিকে যাচ্ছি। এই সময়ে Diversified যে World, Unified Globalized Condition এ আমরা আছি। এই সময়ে এই তুরিকার শিক্ষাগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আমাদের আলোচক কিছু আলোচনা করেছেন। 'কফ্ফে লেসান'র কথা বলেছেন। আমি শুধু সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, সোশ্যাল মিডিয়াসহ মিলে নানা শিক্ষা-দীক্ষা যেভাবে Spread করেছে, সবাই বুঝতে পারছে, জানতে পারছে, শিখতে পারছে, পৌছতে পারছে। বুঝতে পারুক আর না পারুক তথ্য মিলছে। কাজে কাজে

আগে যেভাবে একটা গঞ্জির মধ্যে 'কফ্ফে লেসান' সম্ভব ছিল এখন হয়তো সেভাবে সম্ভব কিনা আমি নিশ্চিত নই। এই সঙ্কটটা, যে সঙ্কটের দিকে উনি ইঙ্গিত করেছেন, যে Sensitivity'র দিকে ইঙ্গিত করেছেন, সেই Sensitivity কে Address করার জন্য নতুনভাবে ভাবা দরকার কিনা? কারণ পরিস্থিতিটাই নতুন। স্কলারগণ যখন লিখে গিয়েছেন আজকে থেকে দুশো, তিনশো, পাঁচশো, সাতশো, এক হাজার বছর আগে, সেই পরিস্থিতি আর আজকের পরিস্থিতি এক নয়।

যাই হোক, মাইজভাঞ্জরীয়া তুরিকার বৈশিষ্ট্য বা এটি যদিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে Averagely এ সমস্ত জায়গায় আমাদের একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত, আমাদের চিন্তাগুলো এদিকে নিবদ্ধ করা উচিত, ভাবা উচিত। এভাবে ভাবলে আমাদের সমাজ উপকৃত হবে, আমাদের উম্মাহ উপকৃত হবে এবং বিশ্ব সমাজ উপকৃত হবে। কারণ আমরা এখন সবাই Connected, কেউ বিচ্ছিন্ন নই। একজনের একটি কাজ আরেকজনকে Impact করবে। একজনের একটি ভুল আরেকজনকে Impact করবে। কাজে কাজে আমাদের এই তুরিকার আহ্বানটি আমার বিশ্বাস এই সমস্ত জায়গায় আমাদেরকে সাহায্য করবে। কুরআন এবং সুন্নাহ আমাদের Main এবং primary Guideline। এরপরে আমরা যখন Guideline খুঁজবো, আমরা আমাদের সাহায্যে কেবলের পরে যে Guideline গুলো খুঁজবো, এমনকি সমস্ত মানুষ যখন Guideline খুঁজবে তখন সফলতা যদি আমরা চাই, সেই সফলতার চাবি আমাদের জন্য নির্ভর করে 'ফজিলতে রব্বানী' প্রাপ্ত আল্লাহর বান্দার প্রতি আনুগত্যের ভেতর দিয়ে। ফজিলতে রব্বানীপ্রাপ্ত বান্দার সর্বোত্তম উদাহরণ হচ্ছে আঁকা মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্ (দ.) এবং সমস্ত সালেহীন বান্দা তথা আউলিয়ায়ে কেলাম। এই তুরিকা সালেহীন বান্দাগণ যেটা করেছেন, রাসুলে করিম (দ.) এর যে আদর্শ নির্দেশনা এবং তারই প্রতিফলনে সমস্ত শিক্ষাবিদগণ, আমাদের মুরবিগণ, সালেহীনগণ যদিও ডেকেছেন সেই দিকে মাইজভাঞ্জরীয়া তুরিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি- তাওহীদ, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সচেতন হওয়ার জন্য মানবকে আহ্বান করে।

সৃষ্টির সাথে সৃষ্টির ভালবাসার সম্পর্কের দিকে মানবজাতিকে সচেতন করে। বৈচিত্র্য অর্থাৎ ডাইভারসিটি, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা সম্ভূত। আমরা অনেক সময় নানান ধরনের মানুষকে দেখলে ঘাবড়ে যাই। বৈচিত্র্য যখন আমরা Deal করতে পারি না, আমরা নানানভাবে চেষ্টা করি এটিকে ইউনিফর্মড করে ফেলার জন্যে। কিন্তু মাইজভাঞ্জরীয়া তুরিকা বলেছে এটি সম্ভব না। Uniformity is not Possible। কারণ এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছা নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছাই হচ্ছে এই দুনিয়াতে বৈচিত্র্য

থাকবে।

আমাদের কাজ হচ্ছে সেই বৈচিত্র্য ম্যানেজ করা। আমাদের সফলতা হবে সেই বৈচিত্র্যকে সফলতার সাথে ম্যানেজ করা। এটি হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা, আমাদের দায়িত্ব। আমরা Non United Heterogeneous Society-কে কেমন করে ঠিক রাখব, Harmonious society তে আমরা ট্রান্সফর্ম করব, এটিই হচ্ছে আমাদের দায়িত্ব। সমস্ত বৈচিত্র্য বিনাশ হয়ে সবাই একই ফরম্যাটে একই ইউনিফর্ম গায়ে দিবে, একই ইউনিফর্ম সবার গায়ে স্যুট করবে, ফিট হবে-এটি হবে না। কারণ এটি সম্ভব হবে না। কেউ চেষ্টা করলেও সফল হবে না। কারণ এই বৈচিত্র্য আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের ইচ্ছা সম্মত। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ রাক্বুল আলামিন যদি চাইতেন তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিন এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবী বৈচিত্র্যময় করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। কারণ রাসূল (দ.) বলেছেন, আগের উম্মত ৭২ ফেরকা হয়েছে, আমার উম্মত ৭৩ ফেরকা হবে। সুতরাং ৭৩ ফেরকা তো থাকবেই সমাজে। আমরা যদি মনেও করি এক ফেরকায়ই আনতে পারব, তাহলে তো রাসূল (দ.)-এর হাদিস শরিফ (নাউয়ুবিল্লাহ) মিথ্যা প্রমাণ হয়ে যাবে। এ জন্য বলছি যে, বুঝতে হবে। এই বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়ে এই বৈচিত্র্যকে ব্যবস্থা করার দায়িত্বই হচ্ছে আমাদের কাজ। এই বৈচিত্র্যকে বিনাশ করার চেষ্টায় অর্থাৎ ‘কোন বৈচিত্র্য থাকবে না, সব একই রকম হয়ে যাবে’ এই ধরনের চিন্তা-চেতনা, আদর্শ লালন-পালন করলে এটি সফল হবে না। কারণ এটি আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে।

এই ত্বরিকা- বৈচিত্র্য অথবা ডাইভারসিটি যাকে বলা হয়, Pluralistic Situation, Society এটি যে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের ইচ্ছা সম্মত, এই কুরআনিক সত্যতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি কুরআনিক সত্য, এটি একটি সুন্যাহ সম্মত সত্য। কুরআন হাদিসের জমআনী নীতিতে অর্থাৎ কুরআনুল কারীম এবং হাদিস শরিফের যে Spirit, Spirit of Quran, Spirit of Hadith হচ্ছে সমস্ত মানব জাতি মিলে মিশে একসাথে থাকবে। সংঘাত, সংঘর্ষ, বিরোধ, ফেতনা, ফ্যাসাদ, দাঙ্গা এড়িয়ে সমস্ত মানবজাতি একটা জায়গায় থাকবে। যেহেতু সমস্ত বিশ্বের মানুষ কোন না কোন ধর্মে বিশ্বাস করে। এই সত্যের দিকেও এই ত্বরিকা দৃষ্টি করে যে, সকল ধর্মের মূলে একই মহাসত্য অনুরণিত। অর্থাৎ আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের স্বীকৃতি, স্রষ্টার স্বীকৃতি, আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং আল্লাহ রাক্বুল আলামিনের দিকে যাওয়ার একটি চিন্তা-চেতনা কিন্তু প্রত্যেকটি ধর্মের গভীরে নিহিত আছে। বাহ্যিক দিক হতে হয়তো নানানভাবে যেটি আমরা বাইরে দেখছি, সেই রকম নানান বিষয় আশয় আছে এটা ঠিক আছে, কিন্তু মূলের দিকে

প্রত্যেকটা ধর্মই আল্লাহ্ তাওহীদে বিশ্বাসী এবং আল্লাহমুখী হওয়ার জন্য তাদের আহ্বান আছে। এই যে কমনালিটিজ, এত ডিফারেন্স এর মধ্যে যেহেতু আমরা এক সাথে এই পৃথিবীতে থাকতে হবে, তাই কমনালিটিজগুলোর ভিত্তিতে আমাদেরকে একত্রিত হতে হবে। এখন আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা শুধু ডিফারেন্সগুলো দেখতে থাকি।

আমাদের মধ্যে যে কমনালিটিজগুলো আছে, যে মিলগুলো আছে, সেটিকে আমরা উপেক্ষা করি অনেক সময়। যার ফলে আমরা নানান সঙ্কটের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাই। এটিও এই ত্বরিকার একটি শিক্ষা যে, এই কুরআনিক সত্যের ভিত্তিতে, ‘সকল ধর্মের মূলে একই মহাসত্যের সত্য অনুরণিত’ কুরআন-হাদিস ভিত্তিক এই সত্যের ভিত্তিতে আমাদেরকে সভ্যতা নির্মাণ করার জন্যে এই ত্বরিকা আহ্বান করে।

ধর্মঝগড়া পরিহার করার জন্যে এই ত্বরিকা আমাদের বারেবারে তাগিদ দেয়। ধর্ম নিয়ে ঝগড়া, প্রতিযোগিতা ইসলামের কাম্য নয়, ইসলামের এটি লক্ষ্য নয়। কুরআনুল কারীমে পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে বলেছেন ‘লা হুজ্জাতা বাইনানা ওয়া বাইনাকুম’; “আস! আমরা সেই কথার উপর একমত হই, যেই কথা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে কমন যে, আল্লাহ রাক্বুল আলামিন হচ্ছেন আমাদের স্রষ্টা”-এটি হচ্ছে কুরআনের আহ্বান। এই আহ্বানের দিকে মাইজভাগুরীয়া ত্বরিকা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মঝগড়া ধর্মের প্রতিযোগিতায় আমরা বুঝতে পারি না, আসলে আমরা অনেক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটতে দেখি। কিন্তু অনেক দূর থেকে অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না, এটি আসলে ধর্ম প্রতিযোগিতা কিংবা ধর্মঝগড়ার একটি পরিণাম মাত্র। এটি ইসলামের কাম্য নয়, ইসলাম এই শিক্ষা দেয় না। এজন্য মাইজভাগুরীয়া ত্বরিকাও এই ধর্ম ঝগড়া প্রতিযোগিতার পরিবেশ থেকে যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি সেই সতর্কতা আমাদেরকে দেয় এবং যেকোন সমস্যায় উত্তেজনা পরিহার করে শান্তিপূর্ণ সমাধান করার শিক্ষা দেয়। যেটা আমরা ভাবতেই পারি না। আমরা মনে করি একটি অন্যায় সাধন হলো তাই হৈ চৈ না করলে এটি সমাধান করা যাবে না। কিন্তু এটি যে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যায়, উত্তেজনা পরিহার করে সমাধান করা যায় এটি আমরা অনেক সময় ভাবতেই পারি না। কারণ এই কাজটি কঠিন। কতটা কঠিন এটা আমরা যখন শাহাদাতে কারবালার আলোচনা এবং ইমাম হোসাইন (রা.)’র জিকির করব তখন দেখবো যে, এই কাজটি কত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কত কঠিন।

উত্তেজনা পরিহার করে শান্তিপূর্ণভাবে, ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং ধর্মীয় বিরোধ সমাধানের ইসলামী নীতিমালার দিকে এই ত্বরিকা আমাদেরকে উৎসাহিত করে, আহ্বান করে।

অর্থ সম্পদ-সোজা কথায় টাকা পয়সা যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মাঝে আবদ্ধ না থেকে সমাজের সকল স্তরে অর্থ সম্পদ আবর্তিত হয় তার জন্যে কর্ম উদ্যোগ গ্রহণে এই ত্বরিকা

অনুপ্রাণিত করে। এটি ইসলামের একটি অর্থনৈতিক নীতির কথা বলছি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এই ত্বরিকা ‘হাকিকতে শরীয়ত’ কে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে গুরুত্ব দেয়। এটার অর্থ হচ্ছে হযরত খিজির (আ.)-এর যে Wisdom, উনার যে inside-অন্তর্দৃষ্টি, উনি যে সমস্যাগুলো সমাধান করেছেন তা বাইরে থেকে দেখতে খারাপ মনে হয়েছে, কিন্তু এটা আসলে হাকিকতে একটি কল্যাণকর কাজ ছিল।

অনেক কাজ আমাদের আছে যেগুলো বাইরে থেকে হয়তো মনে হতে পারে ‘এটি ঠিক হচ্ছে না’। কিন্তু এটি যদি হাকিকতে শরীয়তকে, মাকাসিদুশ শরীয়াহকে Uphold করে, তাহলে এটি আমাদেরকে মেনে নিতে হবে। এটি পছন্দ না হলেও এটির হাকিকত বুঝার জন্য আমাদের চিন্তাকে নিবিষ্ট করতে হবে। বিশেষ করে এটি যদি কোন একজন আল্লাহর অলি, স্কলার, পণ্ডিত থেকে আসে যার স্বীকৃতি জগৎ বিখ্যাত।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতার যে ইসলামী নৈতিকতা রয়েছে তা আমরা ভুলভাবে লালন করেছি। এমন একটি অবস্থায় পড়েছি যে, আমরা যদি আরবের কথা বলি, অত্যন্ত সাম্প্রতিক সময়েও বা কিছুদিন আগেও আরবে অন্য ধর্মাবলম্বী যারা আছেন তারা কিন্তু নিজ ধর্ম পালন করতে পারতেন না। আরবে, মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে। এটি তারা করতেন ইসলামী নৈতিকতার অংশ মনে করে। Unfortunately ইসলামী নৈতিকতা হচ্ছে ঠিক তার বিপরীত দিক। আমরা প্র্যাঙ্টিস করেছি বিপুলভাবে ইসলামের নামে একটি ভুল দর্শনকে, ভুল নীতিকে লালন করেছি, যেটি ভুল মেসেজ দিয়েছে সমস্ত বিশ্বকে, একটি ভুল বার্তা দিয়েছে। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা এটি হচ্ছে ইসলামী নৈতিকতা। এই ইসলামী নৈতিকতার ঝাঞ্জ এই ত্বরিকা উর্ধ্বে তুলে ধরে রাখে।

এই ত্বরিকা শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার নয়, অনুসন্ধানী বিনয় নিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে। গাউসুল আযম শায়খ সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)’র একটি কিতাবের নাম ‘আল গুনিয়া লিত ত্বালিবি ত্বারিকিল হক’। এই বইটি হচ্ছে একটি সম্পদ। কার জন্য সম্পদ? এটি গুনিয়া। কার জন্যে? ‘লিত ত্বালিবি ত্বারিকিল হক’ যে ত্বালেব অনুসন্ধানী। কিসের অনুসন্ধানী? ত্বারিকিল হক- যে সত্য পথের অনুসন্ধানী। আমরা বলি ত্বালেবে ইলম, এই ত্বালেবের বিনয় নিয়ে; শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার নিয়ে নয়। এই ত্বরিকার একজন Seeker হিসেবে, অনুসন্ধানী হিসেবে, সত্যের অনুসন্ধানী হিসেবে, যে “আমার মধ্যেও তো ভুল আছে, আমি সব কিছু বুঝে যাইনি, আমার অনেক কিছু বুঝার ভুল থাকতে পারে” এই বিনয় অন্তরে ধারণ করে শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কারকে দূরে ঠেলে দিয়ে এই ত্বরিকা ইসলামের দাওয়াত প্রদান করে। যে দাওয়াত প্রদান করে সেগুলো প্রত্যেকটি ইসলামের দাওয়াত। আমি এতক্ষণ

যেগুলো বলেছি এগুলো প্রত্যেকটি ইসলামের দাওয়াত। এই ত্বরিকার দাওয়াত মানে ইসলামের দাওয়াত।

মাইজভাগুরীয়া ত্বরিকার মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ ‘বেলায়তে মোতলাকা’য় ত্বরিকার এই দর্শনকে আদলে মোতলাক, তাওহিদে আদইয়ান শিরোনামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ধর্মসাম্য অর্থাৎ ধর্ম ঝগড়া পরিহার করে সকলে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে, বিচারসাম্য অর্থাৎ বিচারের ক্ষেত্রে আমরা আদল করব, এহসান করব। শুধু আদল নয়, এহসানও করবো। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাগুরী শিক্ষা দিয়েছেন যে, দুজনে ঝগড়া লেগেছে, তুমি কিছু ছেড়ে হলেও সমাধান করে ফেল। হ্যাঁ, তুমি ৫০ পার্সেন্ট পাও, কিন্তু তুমি ২ পার্সেন্ট ছেড়ে দাও। তুমি ৪৮ পার্সেন্ট নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাও। তাও বিরোধ বিনাশ হয়ে যাক, সংঘাত বিনাশ হয়ে যাক। ধর্মসাম্য মানে এটি নয় যে, সব ধর্ম এক হয়ে যাবে। বিষয়টি এভাবে নয়। আবার ধনসাম্য মানেই সবার হাতে এক লাখ করে টাকা থাকবে, কারও কাছে এক কোটি কারও কাছে দশ হাজার টাকা থাকবে না, এরকম না। এটির হিসাব অন্য। কেন কারও কাছে এক কোটি টাকা, কারও কাছে ১ টাকাও থাকে না-এটি ভিন্ন হিসাব। কিন্তু আমাদের সামাজিক নীতিমালায় ধনসাম্যের অর্থ হচ্ছে অর্থ-সম্পদ আবর্তিত হবে, আমাদের যাকাত সিস্টেম এবং Other যে চ্যারিটি আছে, এই চ্যারিটিগুলোর ভেতর দিয়ে ধন সম্পদ আবর্তিত হতে হবে। যাতে মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা যায়। এই ধারায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে বেলায়তে মোতলাকা কিতাবে। এতক্ষণ যেগুলো বললাম তা মাইজভাগুরীয়া ত্বরিকার practical Analysis, Theoretical presentation। আর এর Demonstrative বা Implementation Applied যে Form ঐ Form- এর নাম হচ্ছে উসূলে সাব’আ বা সপ্তপদ্ধতি।

আজকে এগুলো বলছি না, শুধু নামগুলো বলছি। তিনটি ফানা। অর্থাৎ নিজেকে নিশ্চিত করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ফানা আনিল হাওয়া, নিজের মধ্যে অনর্থকে পরিহার করা। ফানা আনিল খালক, কারও উপর নির্ভরশীলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে ফেলার কথা বলা হয়েছে এবং ফানা আনিল ইরাদা-নিজের ইচ্ছাকে, ইরাদাকে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামিনের ইচ্ছায় ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তিনটি ফানা এবং চারটি মৃত্যু। মওতে আব্বইয়াদ, মওতে আসওয়াদ, মওতে আহ্মর এবং মওতে আখ্জার। চারটি মৃত্যু, তিনটি ফানা এই মিলে মাইজভাগুরীয়া ত্বরিকা। এটি এমন একটি ফর্মুলা, এমন একটি লিস্ট, এমন একটি প্র্যাঙ্টিস ফর্ম Propose করা হয়েছে, যেটি মুসলিম তো করতেই পারবে, সমস্ত ধর্মের মানুষও এই প্র্যাঙ্টিস করতে পারবে। এটি সকলকে উপকার করবে। এই জন্যে আমরা বলি যে, কুরআন হচ্ছে সমস্ত বিশ্বের জন্যে, ইসলাম হচ্ছে সমস্ত বিশ্বের জন্যে। আমাদের নবী হচ্ছেন বিশ্বনবী, বিশ্বের জন্যে।

কিন্তু এগুলো বলে আমরা আস্তে করে আমাদের নবীকে আমাদের দিকে নিয়ে আসি। নবীর উপর আমার মত করে ঈমান এনেই যদি সে বিশ্বাসী হয়ে যায়, তাহলে তো সে মুসলিমই হয়ে গেল। যারা অমুসলিম তাদের প্রতি রাহমাতুল্লিল আলামিনের রহমতের কী থাকলো? বিশ্বনবীকে বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে আমাদেরকে বুঝতে হবে, মানতে হবে। আমরা যদি মনে করি যে, নবী করিম (দ.) শুধু মুসলিমদের জন্য এসেছে, কুরআনুল করিম শুধু মুসলমানদের জন্য এসেছে ‘বিষয়টি’ এরকম নয়।

সবাই এই কুরআনুল করিম থেকে যার যার নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী উপকৃত হতে পারবে। শুধু তাকে ইচ্ছুক হতে হবে, তার মনে ইরাদা থাকতে হবে। তাকে একটু তালেব হতে হবে। সে যদি সন্ধানী হয় তাহলে আমরা আশা করতে পারি যে, সে উপকৃত হবে। তার রূহানী জগৎ গুরু হবে। পরিণামে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে মুক্তি দিতে পারেন।

যাই হোক, আমি এই ব্যাপারে আর না বলি। আমি সবাইকে এই ইসলামী সুফি দর্শন, যা সমসাময়িক, কুরআনিক এবং সুন্যাহ সন্মত, সমসাময়িক যুগ সমস্যার সমাধান যেখানে পেশ করা হয়েছে এই সম্পর্কে জানার জন্যে সবাইকে অনুরোধ করছি।

আমরা কারবালার আলোচনার মাহফিলে এসেছি। কারবালার আলোচনার সাথে আশুরার আলোচনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আশুরা হচ্ছে মহররম মাসের অর্থাৎ ইসলামিক ক্যালেন্ডারের Lunar Month-এর প্রথম দশ তারিখ। এটিকে আশুরা বলা হয়। এটি গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে কারণ, পেয়ারা নবী আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তফা (দ.) যখন মদিনা শরিফে দেখলেন ইহুদীরা এই মহররমের দশ তারিখে রোজা রাখছে, রাসূলে করিম (দ.) বললেন যে, তারা কেন রোজা রাখছে? কারণটি যখন উনাকে জানানো হলো, তখন তিনি বললেন যে, হযরত মুসা (আ.)-এর উপর তো আমার অধিকার বেশি। কাজে কাজে উনিও রোজা রাখলেন এবং সাহাবায়ে কেলামকে রোজা রাখতে নির্দেশ দিলেন। এটা কী ঘটলো! এটা কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং। ইহুদিদের একটি ধর্মীয় আচরণকে উনি Assimilate করলেন, উনি গ্রহণ করে নিলেন, কবুল করে নিলেন। উনি বললেন না যে, ওরা যা করছে আমি তা করব না, আমি এটি নিবই না। উনি কিন্তু রোজাটি নিলেন। যেহেতু পেয়ারা নবী শেষ নবী এবং উনাকে ছাড়া রেসালতের ইসলামের যে ঘর, সেই ঘর অসম্পূর্ণ। রাসূলে করিম (দ.)-কে দিয়ে সেই ইসলাম রূপ ঘর সম্পূর্ণ হয়েছে। উনি ছিলেন সর্বশেষ সেই স্বর্ণালী ইট, যা সেই ঘরকে কমপ্লিট করেছে। স্বর্ণালী সেই উপাদানকে যদি স্বীকৃতি দেওয়া না হয়, সেই ঘরটি কমপ্লিট হয় না। এ জন্য উনি Differentiate করেছেন যে, ঠিক আছে- আমরা ৯ তারিখও রোজা রাখবো। আমরা নিলাম কিন্তু, আমরা Deny করলাম না, Denial Syndrome

এ Suffer করলাম না। “ইহুদিরা করছে এজন্য আমি করব না, ইহুদিরা খারাপ” এভাবে উনি বললেন না। উনি বললেন যে, “হক আমাদের বেশি, এজন্য আমরা এটা করব”। এটি উনি গ্রহণ করলেন। এটি আমাদেরকে ইসলামের যে মহত্ত্ব, বিশালত্ব, উদারতাকে পরিষ্কৃতিত করে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। আশুরা এভাবেই চলে এসেছে। মহররম মাসকে বলা হয় মাহাররামুল হারাম। এই মাসে আইয়ামে জাহিলিয়া যুগেও যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে, রক্তপাত থেকে বিরত থাকা হত। কয়েকটা মাস-রজবুল আছম, জিলকুদ, জিলহজ্জ, মুহাররম। চারটি মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে এমনকি যুদ্ধবাজ গোত্র, ট্রাইবালিজমের যে গোত্র প্রথা, নিজের সম্মানের জন্যে বা নিজের একটি গোত্রের সদস্যের কোন ভুলকে ডিফার করার জন্যে শত বছরের যুদ্ধও যারা চালিয়েছে, তারাও এই মহররম মাসে অস্ত্রধারণ করত না, বিরত থাকত। এই হচ্ছে মহররম মাস। ঠিক এই মহররম মাসে ঐ আশুরায় ৬১ হিজরীতে রাসূলে করীম রাউফুর রাহীম (দ.)-এর প্রিয়তমা পত্নী হযরত খাদিজা (রা.)’র কন্যা সন্তান, জগৎ জননী মা ফাতিমা (রা.)’র সন্তান হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যান। সেই ইতিহাসটি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, ইমাম হোসাইন কোন পরিস্থিতিতে মদিনা ছেড়ে মক্কায় গেলেন, মক্কা ছেড়ে কুফায় যাত্রা শুরু করলেন। ইমাম হোসাইনের যাত্রা যুদ্ধ যাত্রা ছিল না। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে একটু গভীরভাবে দেখা দরকার। ইমাম হোসাইনের সেই যাত্রার কারণ- এই মাস তো মহররম মাস। পরিবার পরিজন নিয়ে তো কেউ যুদ্ধ যাত্রায় যায় না। উনি তো যুদ্ধ যাত্রা করেননি এবং উনার যে আকাঙ্ক্ষা এটি কোন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এটি ছিল নৈতিক আকাঙ্ক্ষা, রাজনৈতিক নয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, সারাক্ষণ এটিকে রাজনৈতিক একটি সংঘাত হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এটি ছিল নৈতিক একটি আকাঙ্ক্ষা থেকে। কারণ রাসূলে করিম (দ.)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে চারটি দায়িত্বের কথা কুরআনুল করিমে বারে বারে বলেছেন- ‘ইয়াতলু আলাইকুম আয়াতিনা, ওয়াইউজাক্কিকুম, ওয়াইউ আল্লিমুকুমুল কিতাব, ওয়াল হিকমাতা, ওয়াইউ আল্লিমুকুম মা লাম তাকুনু তা’লামু। রাসূলে করিম (দ.)-এর এই চারটি কাজের কথা অন্তত তিনবার কুরআনুল করিমে বলা হয়েছে। একবারও এখানে এই দায়িত্বের মধ্যে রাজনীতি নেই, আধ্যাত্মিক নীতি আছে। কিতাব পড়ে শুনাবেন আপনি, পবিত্র করবেন তাদেরকে, তাদেরকে আপনি কিতাব এবং হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং সেটুকু জানাবেন যা তারা জানত না। সিয়াসতের কোন শর্ত, সিয়াসতের কোন দায়িত্ব এই চারটি দায়িত্বের মধ্যে নেই। সিয়াসত-রাজনীতি আমাদের সামাজিক মুয়ামালাতের অংশ। এটি আমাদের জীবনে থাকবে। ইসলামেও এর গাইডলাইন আছে। কিন্তু ইসলাম কোন রাজনৈতিক ধর্ম নয়। ইসলাম হচ্ছে একটি Spritual ধর্ম,

রুহানিয়্যাতের ধর্ম। রাজনীতি যতটুকু আছে অতটুকু হচ্ছে মানুষের জীবন চলার জন্যে সামাজিক নীতিমালা। এটির ইসলামে গাইডলাইন আছে। ঐ গাইডলাইন মেনে কেউ নিশ্চয়ই রাজনীতি করতে পারে। ইসলামের আদর্শে রাজনীতি করতে পারে, ইসলামের নামে নয়। ইসলামের নামে রাজনীতি করলে তার মধ্যে নেফাক আসবে। সে শেষ পর্যন্ত ইসলামকে ব্যবহার করা শুরু করবে এবং তার নিজের দোষ-দুর্বলতাগুলো যখন সামনে আসবে তখন সে ইসলামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। এটা সাধারণ মানবিক দুর্বলতা। এ জন্য ইসলামের আদর্শে রাজনীতি হওয়া উচিত। সমস্ত দেশে দেখবেন ইসলামের নামে কোন রাজনৈতিক দলের নাম হয় না। নাম হয় “জাস্টিস পার্টি”। এভাবে নামগুলো হয়। কিন্তু আমাদের দেশে অবশ্য উল্টা হয়েছে। তারা ইসলামের নাম ব্যবহার না করে রাজনীতির কথা কল্পনাও করতে পারে না। এটা হচ্ছে এক ধরনের Advantage নেওয়া। আমার কাছে মনে হয়েছে এটা একটা psychological game, brain game। ধর্মের নাম নিয়ে একটা Advantage নিয়ে নেওয়া, এটা ঠিক না। মহররম মাসে যুদ্ধ করার মাধ্যমে যে ক্ষতিটা হলো- নৈতিক অবক্ষয়ের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে গেল। নিষ্ঠুরতার অন্তহীন প্রদর্শনী হয়ে গেল। কী হয়েছে? ইমাম হোসাইন (রা.) কোন পাপ-অপরাধ করেননি। কোন সামাজিক ব্যক্তিগত অপরাধ করেননি। (তিনি ছিলেন) নিরপরাধ শান্তিপ্ৰিয়। তিনি কোন যুদ্ধ যাত্রায় যাননি। মহররমুল হারাম মাসে উনি যুদ্ধ যাত্রায় যাননি। তিনি বায়াতের জন্য গিয়েছেন। উনি শুধুমাত্র ভিন্নমত পোষণ করেছেন। ভিন্নমত পোষণ করেছেন সেই জন্যে তাঁর শান্তিপ্ৰিয় কাফেলাকেও নিষ্ঠুরভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে কাজ করা হয়েছে। ইমামের শরীরে সত্তরের অধিক আঘাত, ঘোড়া দিয়ে ইমামের শরীরকে দলিত করে মস্তক বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। এটা অকল্পনীয়! এটা যে ইসলামী জগতে ৬১ হিজরীতে ঘটতে পেরেছে সেটা একটা অকল্পনীয় ঘটনা। আপনি যুদ্ধ করতে পারেন, অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু কারও মস্তক কর্তন করে যা-তা, তাও আবার আহলে বাইতে রাসুল (দ.)! বর্ষার আগায় ঝুলিয়ে মিছিল করে ট্রেতে করে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া এটি তো একটি অকল্পনীয় ঘটনা।

এর পরবর্তী ঘটনা কী হয়েছে? মক্কা আক্রমণ হয়েছে, মক্কা অপমানিত হয়েছে। এরপরের বছর মদিনাও অপমানিত হয়েছে। সর্বনাশের ষোলকলা পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। ইসলামের অতি সুন্দর একটি ভবিষ্যত ইমাম হোসাইনের উপর এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে দিয়ে বিনাশ করে দেওয়া হয়েছে।

কারবালা আসলে ইমাম হোসাইনের উপর হয়েছে না ইসলামের উপর হয়েছে-আমি অনেক সময়ে বুঝতে পারি না। ইসলামের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত করে

ইসলামের সুন্দর একটি ভবিষ্যতকে বিনাশ করে দেওয়ার যে ঘটনা এবং ইমাম হাসান-হোসাইন যে নেয়ামত এই নেয়ামত যে আমরা হারিয়েছি তার জন্য আশেকগণ কান্না করে, ক্রন্দন করে। এই ক্রন্দনকে অনেকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন। শরীয়তের নাম দিয়ে নানানভাবে এটিকে বলতে চায়। অথচ আমরা জানি যে, হযরত ইউছুফ (আ.) হারিয়ে যাওয়াতে হযরত ইয়াকুব (আ.) বছ বছর কেঁদেছেন। হযরত বিলাল (রা.) আজান দিতে পারতেন না। কারণ রাসূলে পাক (দ.)-এর নাম মোবারক যখন উচ্চারণ করতেন আজানের মধ্যে, তখন ক্রন্দনের জন্য আজান দিতে পারতেন না, এই শোকে তিনি সিরিয়াতে চলে যান। ইমাম জয়নুল আবেদিন এতো ইবাদত করতেন যে, সারারাত ইবাদত করতেন, সারাদিন রোজা রাখতেন। তিনি ইফতার করার সময় চোখের পানিতে তাঁর খাবার ভিজে যেত।

আর এখন যদি আমরা কান্না করি সেটাকে অনৈসলামিক বা শরীয়তের নামে আমাদেরকে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অথচ আল্লাহর নেয়ামত হারানোর জন্য শোক করা এটি ঈমানী জজ্বার লক্ষণ। এই উদাহরণগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি। তাই আমরাও শোকে ক্রন্দন করি। দয়া করে বাধা দেবেন না।

সুফিমতকে বাধা দিয়ে, সুফি রাক্স অর্থাৎ আমরা যে নৃত্য করি এটাকে বাধা দিয়ে, বাউল গানের মাধ্যমে মনের গভীরে আল্লাহ প্রেমের যে প্রকাশ- এ প্রকাশকে বাধা দিয়ে, কারবালার শোককে বাধা দিয়ে ইসলামের প্রাণশক্তিকে দয়া করে রুদ্ধ করে দেবেন না। কারবালার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এই যুগে ফিকাহ সিস্টেমে প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করে মুসলিম উম্মাহকে তার দায়িত্ব পালনে সুযোগ করে দিন। বিশ্ব সমাজ ইসলামকে নিয়ে যে ভুল বুঝছে, তা নিরসনে সাহায্য করুন। এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে আমার বক্তব্য শোনার জন্যে ধন্যবাদ এবং আমার দীর্ঘ সময় নেওয়ার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে আয়োজককে ধন্যবাদ, যারা সহযোগিতা করেছেন সকলকে ধন্যবাদ। উলামায়ে কেরাম যারা আলোচনা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ। আমরা যাতে শোহাদায়ে কারবালার আদর্শকে, প্রেমকে, শোককে, লালন করতে পারি, এটিকে যাতে আমরা শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারি আল্লাহ রাক্বুল আলামিন আমাদেরকে সেই তাওফিক দান করুন, এই মাহ্ফিলকে কবুল করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াব্বারাকাতুহু।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় শানে রাহমাতুল্লাহ আলামিন কনফারেন্সে রাহবারে আলম
হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাঞ্জরী (ম.)'র আহ্বান
বিশ্বনবী (দ.)'র বিশ্বদর্শনকে খণ্ডিতভাবে নয়, সামগ্রিক মূল্যায়নের মাধ্যমে
দার্শনিক চিন্তাধারার স্ফুরণ ঘটাতে হবে
(বার্তা পরিবেশক)

নাহমাদুহ ওয়া নুসাল্লি আলা রাসুলিহিল কারিম, আম্মা বাদ।
আউজুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজিম। বিসমিল্লাহির
রাহমানির রাহিম। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লাহিল
আলামিন। সাদাকালাহুল মাওলানালা আজিম, ওয়া সাদাকা
রাসুলুলহন নবিঈল কারিম। ওয়া নাহনু আলা জালিকা মিনাশ
শাহিদিনা ওয়াশ শাকিরিন। মাওলা ইয়া সাল্লি ওয়া সাল্লিম
দায়িমান আবাদান আলা হাবিবিকা খাইরিল খালকি
কুল্লিহিমিন। USA ফ্লোরিডায় আজকের যে অনুষ্ঠান, Eid E
Miladunnabi (PBUH) Organizing Committee,
Florida, USA কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই আলোচনা
সভার সম্মানিত সভাপতি, মঞ্চে উপস্থিত আজকের মেইন
স্পিকার শায়খ সাইফুল আজম বাবর আল আজহারি, উপস্থিত
আছেন মাওলানা নোমান ফারুকী, উপস্থিত আছেন বিশ্বের এই
গুরুত্বপূর্ণ নগরীর, এই এলাকার অধিবাসীবৃন্দ, সমবেত সুধি
এবং আশেকানে মোস্তফা (দ.)- আসসালামু আলাইকুম ওয়া
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি আল্লাহ্ আজ্জা ওয়া
জাল্লার আলিশান দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি, আল্লাহ
রাক্বুল আলামিন আমাকে এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে সবার
সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। আপনারা অত্যন্ত
মূল্যবান ব্যস্ত সময়ের আবর্তনের ভেতর দিয়ে কিছু সময়
আজকের এই মাহফিলের জন্য ব্যয় করার আশ্রয় নিয়ে
এসেছেন তাই আপনাদেরকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আর
অর্গনাইজিং কমিটিকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি,
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শিরোনামে আজকের এই অনুষ্ঠানকে
তারা প্রাণবন্ত করেছেন- শানে রাহমাতুল্লাহিল আলামিন
কনফারেন্স এই শিরোনামে। এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে
আমার আগে আমাদের আজকের স্পিকার আমাদের সামনে
গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। আমি আমার
কিছু ভাবনা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমরা
সৌভাগ্যবান, আমরা ইসলামকে ধর্ম হিসেবে পেয়েছি। প্রিয়
নবী আকায়ে নামদার তাজেদারে মদিনা নুরে মুজাস্সাম
আহমদে মোজতবা মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) কে নবী হিসেবে
পেয়েছি এবং ইসলামকে আমরা আমাদের নৈতিক আধ্যাত্মিক
পরিচয় হিসেবে গ্রহণ করতে পেয়েছি। আমরা মহা
সৌভাগ্যবান। ইসলাম আমাদের জন্য যে ইহসান করেছেন
আমরা কি ইসলামের জন্য সেই ইহসানের প্রতিদান দিতে
পেয়েছি? (আমি মিলিয়ন ডলার Question করছি)। আমি
উম্মাহর কথা বলছি। আমি আমার কথা বলছি না, আমি

আপনাদের কথা বলছি না, আমি আজকের কথা বলছি না।
আমি মুসলিম উম্মাহর কথা বলছি। আমরা কি সেই ইহসানের
প্রতিদান দিতে পেয়েছি? এ কথা এই জন্যেই বলছি যে,
ইসলাম হচ্ছে একটি আদর্শের নাম, একটি দর্শনের নাম। এটি
একটি Civilization তথা সভ্যতার নাম। ইসলাম আমাদের
জন্যে সভ্যতার একটি রূপরেখা প্রদান করেছে এবং সর্বোৎকৃষ্ট
একটি গাইডলাইন আমাদের সামনে উপস্থাপন করে গিয়েছে।
আল্লাহ রাক্বুল আলামিন আমাদেরকে এই যে মহান ইহসান
করেছেন, এর পরে আজকে আমাদের তথা উম্মাহর দায়িত্ব
হচ্ছে এই Civilization, যেটির রূপরেখা ইসলাম দিয়ে
দিয়েছে আমাদের সামনে কোরআন এবং হাদিসের ভেতর
দিয়ে, সেই Civilization তৈরি করা। এটি যদি করতে পারি
তাহলে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারলাম। আর
যদি আমরা না পারি তাহলে আমাদের ভাবতে হবে; অনেক
বেশি করে ভাবতে হবে।

এই Civilization তৈরি করার প্রথম ধাপ কি? সেই
Civilization তৈরি করার দায়িত্ব আমাদের উপর, মুসলিম
উম্মাহর উপর অর্পিত হয়েছে সেই Civilization- সভ্যতা
নির্মাণ করতে হলে মানবিক গুণাবলীতে অগ্রসর দায়িত্বশীল
উম্মাহ্ তৈরির দিকদর্শন- Applied Sociological
Direction সর্বপ্রথম প্রয়োজন। একটা Direction
আমাদের লাগবে, একটা দিকদর্শন; অর্থাৎ কোন দিকে আমরা
যাব। কারণ দিকদর্শন ঠিক না করে যাত্রা করলে গন্তব্য চিরদিন
মরিচিকা হয়েই থাকবে। মরিচিকা কি আমরা সবাই জানি।
দেখা যাচ্ছে খুব কাছে কিন্তু কাছে গেলে মনে হবে আরও
অনেক দূরে। আমরা নানান ঘোর প্যাচের মধ্যে থাকব।
Applied Sociological Direction বলতে আমি
বুঝাচ্ছি- যেমন ধরুন Physics। physics এর দুটো সাইড
আছে। একটা হচ্ছে Theoretical Physics আরেকটা
হচ্ছে Applied Physics। Theoretician রা Theory
দিবেন, আর Applied Physicist, রা সেই
Application গুলোকে নির্মাণ করবেন, তৈরি করবেন, টেস্ট
করবেন, Observation করবেন এবং Applied
Application গুলো Implement করবেন। আমরা যদি
আমাদের Sociological তথা সামাজিক দিকদর্শন ঠিক
করতে না পারি, আমাদের সার্কিট পয়েন্টটা যদি ঠিক না হয়,
গুগল ম্যাপ যদি গুরুত্বই সঠিক Destination দেখাতে না
পারে, পুরো রোডটা একটা সামারি বা লাইনের মধ্যে নিয়ে

আসতে না পারে তাহলে কিন্তু ঐ লাইনটা গন্তব্যে পৌঁছাবে না। এই Direction রাসূলুল্লাহ (দ.)'র যামানায় পূর্ণভাবে বিরাজমান ছিল। যা অগ্রসর হতে হতে বাগদাদে বায়তুল হিকমায় পৌঁছেছে। সেখান থেকে অগ্রসর হতে হতে স্পেনের কর্ডোভা- আল হামরাহ পর্যন্ত পৌঁছেছে। সভ্যতা কিভাবে সর্বদিক দিয়ে বিকাশ হয়েছে আমি সেটা বলছি। ইমামরা এসেছেন, জ্ঞান বিজ্ঞান এসেছে, সমাজ বিজ্ঞান এসেছে। সময় থাকলে এই যে বাগদাদে যে সভ্যতা নির্মিত হয়েছে, স্পেনে যে সভ্যতা মুসলিম উম্মাহ নির্মাণ করেছে সে বিষয়গুলো হয়তো আলাপ করতে পারতাম। আমি সেদিকে যাচ্ছি না। কিন্তু অন্তত এইটুকু Information আমরা সকলে জানি, স্পেনে মোটামুটি ৭০০ বছরের দীর্ঘ অতি উন্নতমানের একটি সভ্যতা মুসলিম উম্মাহ তৈরি করেছে। কিন্তু তারপর কি হল? আমরা তা হারিয়ে ফেললাম। বিচ্ছিন্ন কিছু কারণ ছাড়া সেই মুসলিম জাগরণ বলি, পূর্ণজাগরণ বলি, রেনেসাঁস বা নব জাগৃতি বলি মুসলিম উম্মাহ হারিয়ে ফেলল। সভ্যতা সামগ্রিকভাবে একটি জোয়ারের মত, Its Hugely এটা একটা জোয়ারের মত। সর্বদিক প্রাবিত জোয়ারের মত। সভ্যতা কোন ছোট-খাট বিষয় নয়। (মুসলিম উম্মাহর মাঝে) সামগ্রিক যে জোয়ার ছিল সেটি যেন কোথায় হারিয়ে গেল। সেই হারানো মানিককে যদি আমরা খুঁজে পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে একটি পথরেখা তৈরি করতে হবে। সেই পথরেখার কথাই আমরা আলাপ করছি। সভ্যতা-Civilization নিজে নিজে তৈরি হয় না। প্রবল চেষ্টি, জ্ঞান, চিন্তার প্রাবন, চর্চার স্রোত, অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা না গেলে সভ্যতা টিকে থাকে না। অর্থাৎ এই অনুকূল পরিবেশ যদি না থাকে তাহলে সভ্যতা টিকে থাকে না। এই যে বললাম আমরা হারিয়ে ফেলেছি- (আসলেই) অনুকূল পরিবেশ আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম কিনা, হারিয়ে ফেললে কেন হারিয়ে ফেলেছি এই বিষয়টি আমাদের সমাজ বিজ্ঞানীরা নিশ্চয় দেখবেন এবং আমাদের জানাবেন। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সভ্যতা আমরা হারিয়েছি। আর যদি প্রবল চেষ্টি, জ্ঞান, চিন্তার প্রাবন, চর্চার স্রোত এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা না যায় আমাদের সেই সভ্যতা কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না। সভ্যতা নির্মাণ করতে হলে, মুসলিম উম্মাহ যে সভ্যতা হারিয়ে ফেলেছে আমরা যদি তা আবার নির্মাণ করতে চাই- তবে তা বিশাল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে হাসিল করতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্বশীলতার অংশ। মুসলিম হিসেবে আমাদের যে দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বের একটি অংশ হলো এই সভ্যতা নির্মাণ করা। সেই সভ্যতা নির্মাণ করতে হবে বিশাল কর্মতৎপরতার মাধ্যমে। আমাদের ধারণায় রাখতে হবে যে সভ্যতা নির্মাণে বৈচিত্র্য থাকবেই। বৈচিত্র্যকে নিশ্চিত করার চেষ্টি ভুল এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কারণ তা আল্লাহর ইচ্ছাবিরুদ্ধ একটি চেষ্টি। এথনিক বৈচিত্র্য, কালচারাল বৈচিত্র্য, চিন্তন বৈচিত্র্য, প্রকাশ বৈচিত্র্য, ধর্মবৈচিত্র্য, রাজনৈতিক বৈচিত্র্যসহ অগণিত বৈচিত্র্যের বাস্তবতাকে স্বাভাবিক হিসাবে নিয়ে এর দার্শনিক ভিত্তি অনুধাবন এবং এই দর্শনের ভিত্তিতে সমাজ পরিচালনার দক্ষতা অর্জন একটি আদর্শ ইসলামী সমাজের পরিচয়। এগুলোর মধ্যে ধর্ম বৈচিত্র্য সবচাইতে বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই বিভিন্ন রকম বৈচিত্র্যের সহাবস্থানের

জন্য ধর্ম সমন্বয় পৃথিবীকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় রাখতে সবচাইতে বেশি সাহায্য করতে পারে। আবার ধর্ম সমন্বয়ের অভাবে পৃথিবীকে সংঘাতমুখী সমস্যাপূর্ণ রাখবে। এদিকে ধর্ম শূন্যতা মানুষের নৈতিকতাকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। তাই সকলকে নিজ নিজ ধর্মের নৈতিকতায় সক্রিয় থাকা উচিত। অর্থাৎ নিজ নিজ ধর্ম পালনে সচেতন থাকা উচিত। সকল ধর্মের মৌলিক মিল হচ্ছে স্রষ্টা বিশ্বাস এবং স্রষ্টার একত্ববাদ বিশ্বাসে। যেহেতু প্রত্যেক ধর্ম নিজেদের শ্রেষ্ঠ মর্মে বিশ্বাস করে, তাই মাল্টি রিলিজিয়াস সমাজে ধর্ম প্রতিযোগিতা থাকা স্বাভাবিক। যা সময় সময় ধর্ম ঝগড়ায় পর্যন্ত পর্যবসিত হয়। অথবা চাপা উত্তেজনা এবং অবিচারে সমাজ মনন কলুষিত হয়। এ জটিল মানব রসায়ন শত শত বছর ধরেই সমাজকে উত্যক্ত করতে থাকে। যার সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অভিঘাত সমাজকে এমনকি বৃহত্তর সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। এই পরিস্থিতি পরিহার করে শান্তিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং এর সুষম পরিচালনায় কোরান হাদিসের যে দার্শনিক গাইডলাইন তার এপ্রাইড সোশাল সাইন্সের ফর্মুলা হচ্ছে তাওহীদে আদইয়ান। এটি কোন সুবিধাবাদী নীতি নয়, মানে একটা দেখালাম, অন্যটা আবার সুবিধামত উলটে গেলাম। এটি হচ্ছে ইসলামের ইন্ট্রোডাক্টর সোশাল পলিসি। মূলতঃ একটি সুস্পষ্ট এবং সুন্দর অন্তরতাড়িত দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মতৎপরতার মাধ্যমে বিশ্বজনীন ধর্ম ইসলামের আলোকে মানব সভ্যতা নির্মাণ মানবজাতির অস্তিত্বের জন্যে আবশ্যিক। জটিল সমস্যা সমাধানে দক্ষতা লাগবে, সঠিক প্রশ্ন করা লাগবে। সাধারণ প্রশ্ন করলে হবে না, সঠিক প্রশ্ন করতে হবে। অনেক প্রশ্নের সঠিক জওয়াব দুরূহ হলেও খুঁজে নিতে হবে। সকল সেক্টরে দক্ষ মানুষের যোগান লাগবে। দক্ষ মানুষ তৈরি হওয়ার উন্মুক্ত সুযোগ রাখতে হবে। বিশাল এক সমন্বয়ে কার্যকরী- Effective প্রচেষ্টা লাগবে। ঠেলা গাড়ির মতো শুধু ঠেলে গেলেই হবে না। কার্যকরী প্রচেষ্টা লাগবে, নিজ থেকে এগিয়ে গিয়ে কার্যকরী হতে হবে। এই প্রচেষ্টা ডেউয়ের মতো প্রবাহিত হতে হবে। এই প্রচেষ্টার ডেউ প্রবাহিত হতে হবে উম্মাহর প্রতিটি অংশে- Across the Ummah, All corner of the Ummah। শুধু মুসলিম উম্মাহ না। আমরা খুব Narrow Minded হলে সেই সভ্যতা নির্মাণ করতে পারব না। শুধু মুসলিম উম্মাহ নয়, এই প্রচেষ্টার চিন্তাধারায় বিশ্বমানব সভ্যতা তথা সমগ্র বিশ্বকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা সব কিছু Exclusion করে দিয়ে নিজেরা চারিদিকে দেয়াল তুলে দিয়ে সভ্যতা নির্মাণ করতে পারব না। এই সমন্বয় করাটা কিন্তু চ্যালেঞ্জ। সমস্ত বিশ্বকে অন্তর্ভুক্ত করলে যে Side Effect গুলো আসবে সেগুলোর জন্যে আবার ঔষুধ দিতে হবে। কারণ সমস্ত বিশ্ব আজ Connected। শুধু বিশ্ব সভ্যতা নয়, Inter Religious Connecting অর্থাৎ আমাদের ধর্মের মধ্যে, ইসলামের মধ্যেও যে নানা চিন্তা, ভাবনা, মত আছে এদের মধ্যে Connectivity তৈরি করতে হবে অর্থাৎ Inter Religious Connectivity তৈরি করতে হবে। আমরা ছাড়াও যে নানা ধর্মগুলো আছে তাদের সাথেও আমাদের একটা positive Connectivity লাগবে। এটি কোরআন এবং হাদিস আমাদেরকে করে

দিয়েছে। দেয়াল তোলা সংস্কৃতি নয়, Compartmentalize সংস্কৃতি নয়, Barrier তৈরি করা কিংবা Island জুড়ে দেওয়ার সংস্কৃতি নয়, অর্থোজিক ক্ষতিকারক দেয়াল ভাঙ্গার সংস্কৃতি গড়তে হবে। কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে এই সভ্যতা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আমার ভাল লেগেছে যে, আজকের প্রধান বক্তা সভ্যতার কথা দিয়ে তাঁর বক্তব্যের থিমস সাজিয়েছেন। Coincidentally আমার আজকের ভাবনার সাথে উনার ভাবনা Connected হয়ে গিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্। সমস্ত বাস্তবতা-দায়িত্ব এড়িয়ে, অভিযোগের সংস্কৃতি লালন করে এই সভ্যতা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। উম্মাহর মনন, চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বিবেচনাকে সভ্যতা নির্মাণের উপযোগী কোরআন হাদিসের মর্ম মোতাবেক দার্শনিক চিন্তাধারায় উজ্জীবিত করা না গেলে, সভ্যতা নির্মাণ উপযোগী অসংখ্য ব্যক্তিত্ব তৈরি করা না গেলে, সর্বোপরি কোরআন হাদিসের মর্ম মোতাবেক সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সমগ্র উম্মাহকে ঝংকৃত করা না গেলে এই সভ্যতা নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। এই অনুরনণ, ঝংকার-Resonance-Across the Ummah শোনা যেতে হবে। নতুবা এই সভ্যতা নির্মাণ সম্ভব হবে না। শুধু উম্মাহ জনগোষ্ঠী নয়, সমগ্র মানব জাতিকে নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানমুখী অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusiveness) গোষ্ঠী স্বার্থের উর্ধ্বে, Group Interest এর উর্ধ্বে একটি প্রয়াস নেয়া ছাড়া এই সভ্যতা নির্মাণ সম্ভব নয়, যে সভ্যতার স্বপ্ন আমরা দেখছি, যে হারানো মানিককে আমরা খুঁজে পেতে চাইছি আমি মনে করি তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। ইসলামের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিমালা আমরা পেয়েছি, কোরআনের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ গাইডবুক আমরা পেয়েছি। রাসুল (দ.)'র মতো সর্বশ্রেষ্ঠ গাইড আমরা পেয়েছি। কিন্তু আশ্চর্যের ঘটনা যে, এত সম্পদ পেয়েও মুসলিম উম্মাহ দারুন মানবিক অগ্রসর, advanced একটি সভ্যতা হতে বঞ্চিত হয়ে আছে। এটা আমার অনুভূতি। আপনারা Agree করবেন কিনা আমি জানি না। যদি একমত না-ই হন তবে আমাদের chief speaker এত আক্ষেপ কেন করলেন? এই আক্ষেপকে আমার অনুধাবনের ভিত্তি নিচ্ছি আর কি। আমরা এই বঞ্চনার কারণগুলো সারাক্ষণ আলাপ করতে থাকি। আসলে এগুলো জ্বরের symptom মাত্র। জ্বরটা কোন রোগ নয়। জ্বর হচ্ছে রোগের একটা Symptom। রোগের একটা কারণ আছে। কারণ খুঁজে বের করে যদি রোগের ঔষধটা প্রয়োগ করা না হয় তাহলে জ্বরটা কমবে না। আমরা সব সময় আলাপ করতে থাকি আমরা 'বঞ্চিত হয়ে আছি'। কারণগুলো যখন আমরা আলাপ করি আমরা শুধু Symptom নিয়ে আলাপ করি। যে সমাধান গুলো আমরা দিয়ে থাকি তার অধিকাংশই Utopian। আমি জানি এদিকে যাব, কিন্তু জানিনা কিভাবে যাব- এটাকে বলা হয় Utopian। আমরা বলি এটা করলেই হয়ে যাবে, এটা করলেই সেই সভ্যতা নির্মাণ হয়ে যাবে কিন্তু কিভাবে করলে সেটি নির্মাণ হবে সেই পথটি আমরা দেখতে পাই না। Quinine না ভরলে যেমন জ্বর সারবে না, শরীরে প্রোটিন সাপ্লাই না হলে যেমন শরীর বৃদ্ধি পাবে না তেমনিভাবে কোরআন হাদিসের মর্ম মোতাবেক সমাজ দর্শনের চিন্তাধারার পথ বেছে না নিলে, পথ খুলে না

দিলে, চর্চা না হলে, বহুপথ এবং মতকে স্বাভাবিক হিসেবে গ্রহণ না করলে, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের সংস্কৃতি লালন না করলে, ইসলামের আধ্যাত্মিকতা উপেক্ষা করে ইসলামকে একটি রাজনৈতিক ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে শুধুমাত্র আচার ধর্মের প্র্যাগ্টিসে কাজিক্ত এই সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। এখন বলা হচ্ছে ফিকহ আল তায়াম্মুশ- Fiqh of Co-existence। এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সংস্কৃতি লালন না করে কাজিক্ত এই সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। ব্যক্তি, সমাজ এবং বিশ্ব এই তিনটি লেভেল, তিনভাবে স্থাপিত করার চেতনা প্রয়োগের গাইডলাইন সচেতনভাবে অনুসরণ করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই যে আমি যেগুলো বললাম Unfortunately আমরা কোরআন হাদিসের অনুশাসনের নামে এই পথ রুদ্ধ করে দিই। একটি উদাহরণ দিই- আমরা জানি বিদআত একটি জঘন্য বিষয়। অর্থাৎ বিদআতে সাযিয়াহ একটি জঘন্য বিষয়। এখন এই বিদ'আতের হাদিস শরিফগুলো অনুধাবন না করে আমরা যখন সমস্ত কিছুর ভেতরে বিদ'আত দেখা শুরু করলাম তখন-আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের ভেতর একটা Creative Mind দিয়েছেন, সৃজনশীল একটা মনন দিয়েছেন। এর কাজ হলো সৃষ্টি করা, উদ্ভাবন করা। (এখন আমরা অনেক সময় দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিদ'আতের হাদিস শরিফগুলো ভালভাবে অনুধাবন না করে সব বিদ'আতকে জঘন্য বলে প্রচার করে মানুষের মাঝে আল্লাহ প্রদত্ত যে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তি রয়েছে সেই শক্তি বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিই)। ইসলাম বিশ্বধর্মের নাম। ইসলাম কোন চট্টগ্রামের ধর্ম নয়, ফ্লোরিডার ধর্ম নয়। ইসলাম বিশ্বধর্ম। বিশ্বের প্রতিটি মানব সন্তানের উপকার, প্রয়োজনীয়তা, ভাল মন্দকে ইসলাম ধারণ করে। শুধু মানুষ নয়, Nature, জীবজন্তু সকল কিছুকে ইসলাম ধারণ করে। এটি বিশ্বধর্ম। এসব কিছুর যে চিন্তার পরিসর সেই পরিসর ধারণ করে। কারণ ইসলাম বিশ্বধর্ম, আমাদের নবীও বিশ্বনবী। আমাদের নবী চট্টগ্রামের নবী নয়, মদিনার নবী নয়, আমাদের নবী বিশ্ব নবী। সেই বিশ্ব নবীর দর্শন বিশ্ব দর্শন। সেটি চট্টগ্রামের দর্শন নয়, ফ্লোরিডার দর্শন নয়। বিশ্ব ধর্ম ইসলামের বিশ্ব নবীর বিশ্ব দর্শনকে খণ্ডিতভাবে নয়, Fragmented Manner এ নয়, Holistic Manner এ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়নের মাধ্যমে সঠিক দার্শনিক চিন্তাধারার স্ক্রুণ আমাদের প্রথম ধাপ হিসেবে আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি। একটি স্ক্রুণ ঘটতে হবে। ব্যাপক কর্মযজ্ঞ এবং চিন্তা জগতের বিশাল প্লাবন বইয়ে দিতে হবে। এটির জন্য খুলে দিতে হবে পথ। কাজটা কঠিনতম। আমরা শুধু চিন্তার পথ বন্ধ করেছি। তাই সেই সভ্যতা আমরা হারিয়েছি। এই যে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিমালা, সর্বশ্রেষ্ঠ গাইড বই, সর্বশ্রেষ্ঠ গাইড থাকা সত্ত্বেও মুসলিম উম্মাহ বর্তমান বাস্তবতায় বিরাজমান। বর্তমান বাস্তবতা কি আমরা জানি। আমাদের Chief speaker দীর্ঘক্ষণ এটি বুঝিয়েছেন। এই বাস্তবতা আমাদের কোন দিকে ইঙ্গিত করে। আমরা এই সভ্যতা নির্মাণে যা করণীয় তা করতে, সবাই সম্মিলিতভাবে কার্যকরী পছা নির্ধারণ করতে দীর্ঘ সময় ধরে যে ব্যর্থ হয়েছি তার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অথচ মুসলিম উম্মাহর ভূমিকা হওয়ার

কথা ছিল Change Ambassador। একজন মুসলিম হবেন একজন Change Ambassador। উনি উনার চারপাশ Change করে দিবেন। উনার সমাজকে Change করে দিবেন। উম্মাহ বিশ্বকে Change করে দিবে। এটি হওয়ার কথা ছিল আমাদের Goal, আমাদের ভূমিকা। বিশ্বে আমাদের পরিচিত হওয়ার কথা ছিল Change Mechanism এ। ও তো মুসলিম- এটি একটি জগাখিচুড়ী মাথা ঘর ছিল-সে এটাকে Change করে দিয়েছে। পৃথিবীতে পরিবর্তন আসবেই। এই পরিবর্তনকে সাহসিকতার সাথে, যুক্তিযুক্ত এবং কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করা না গেলে পিছিয়ে পরাটা অবশ্যম্ভাবী এবং তা-ই হয়েছে। সাহসী হতে হবে, ভীতু মনে পালিয়ে বেড়ালে হবে না। আরেকজনের দিকে দায়িত্ব ঠেলে দিলে হবে না। এড়িয়ে চলা, আরেকজনের দিকে Blame game করা কিংবা আরেকজনের দিকে দায়িত্ব ঠেলে দেওয়া, “করার মতো আমার ব্যক্তিত্ব নাই, যোগ্যতা নাই” এভাবে বলে দায়িত্বকে এড়িয়ে গেলে হবে না। এই পরিবর্তনকে Address করার জন্য ইসলাম আমাদেরকে দুটো অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক-Scientific এবং চির আধুনিক Change Management Tool দিয়েছে। যেগুলো দিয়ে আমরা Change করতে পারব। যেগুলো আমাদেরকে Change করার Ability দিবে। যেগুলোর অভাব আমাদের Change করার Ability কে নষ্ট করে দিবে। দুটো জিনিস- একটি হচ্ছে তাজদিদ, আরেকটি হচ্ছে ইজতিহাদ। এই দুটো সমাধান সূত্রের সফল এবং কার্যকরী ব্যবহার আমাদের কাজিকত সভ্যতা নির্মাণে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। অর্থাৎ যে হারানো মানিককে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি সেই হারানো মানিক খুঁজে পেতে হলে আমাদেরকে ইসলাম যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ এবং সফলভাবে কার্যকরী সমাধান সূত্র দিয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্বধর্মের দর্শন তো চট্টগ্রামের হবে না। বিশ্ব ধর্মের দর্শন বিশ্বজনীন। এই বিশ্বজনীন দর্শন চর্চার সাথে সাথে তাজদিদ ও ইজতিহাদের ব্যাপক ব্যবহার ব্যতিরেকে বর্তমানে এই সভ্যতা দাঁড়িয়ে ওঠা সম্ভব নয় বলে মনে করা যায়। দীর্ঘ সময়ের আবর্তনে এই বিষয়সমূহের প্রতি অনাগ্রহ উম্মাহকেন্দ্রিক স্থবিরতা দীর্ঘ সময় ধরে বিশৃঙ্খলা তৈরি করেছে। এই বিশ্বজনীন, Philosophical দর্শনটি আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে, Apply করতে হবে এবং তাজদিদ ও ইজতিহাদের উন্মুক্ত ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। কারণ এই চিন্তাজগৎগুলোকে আমাদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে। এই Tool গুলো আমাদেরকে ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়েছে। নানান অপযুক্তি দিয়ে শিয়ে তুলে রাখার জন্যে নয়। এই উপকরণগুলো বাদ দিয়ে কোরআন হাদিস যে সভ্যতা নির্মাণের দিকে আমাদেরকে নিয়োজিত করে সেই সভ্যতা নির্মাণ করা সম্ভব নয়। এই Change Ambassador হিসেবে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারব তা বুঝার জন্য হযরত ওমর (রা.ডি.)’র একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা জানি যাকাতের খাত হলো আটটি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে মুয়াল্লাফাতুল কুলুবের খাত। অর্থাৎ যারা অমুসলিম কিন্তু ইসলামের প্রতি উলফত-ভালবাসা অন্তরে আছে, ইসলামের প্রতি অনুরক্ত, ইসলামের ভাল চায়, সাহায্য সহযোগিতা করে।

তাদের জন্য যাকাতের একটি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। তারা কিন্তু অমুসলিম। হযরত ওমর (রা.ডি.)’র সময় দেখা গেল- সেখানে এমন অমুসলিম নাই যাদেরকে যাকাত দেওয়ার দরকার আছে, মোটামুটি সেই পরিবেশটা নাই। তখন উনি বললেন যে- এই খাতটি এখন থেকে রহিত করা হল। অর্থাৎ ইসলামের একজন মর্দে মুমিন, Real Change Manager, একজন মুজতাহিদ কি করতে পারে তার একটি নমুনার কথা বলছি। কোরআনে যে আটটি খাতের উপরে যাকাত প্রদান করার হুকুম দিয়েছে এই খাতসমূহের মধ্যে মুয়াল্লাফাতুল কুলুবকে যাকাত প্রদানের হুকুমটি হযরত ওমর (রা.ডি.) তখন ঐ অবস্থা না থাকার কারণে স্থগিত করেছেন। কিন্তু আমরা কি করেছি? ঐ স্থগিত করা বিষয় আজকে ১৪শত বছর ধরে স্থগিত রেখে দিয়েছি। ঐ অবস্থা, সংখ্যাধিক মানুষের প্রায়োগিক প্রয়োজনটা এই ১৪শত বছরে পৃথিবীর কোন অংশে কোথাও কি কখনো দেখা দেয়নি? এটা যদি আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ রাখি তাহলে আমরা কোরআন বিকৃতির দায়ে অভিযুক্ত হব না? এই বিষয়গুলো অবহেলা করে ইসলামের বিশ্বধারা তথা ইসলামের সফল দাওয়াত কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয়। দায়িত্বশীলতা প্রমাণে কোরআনুল করিমের সুরা আন নিসার ১২৩ নাম্বার আয়াত দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করে দিচ্ছি। তবে একটা লাইন বলে দিচ্ছি- আমি এসেছি মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ থেকে। আপনারা জানেন- এটি বাংলাদেশে প্রবর্তিত একটি তুরিকা এবং একটি দার্শনিক চিন্তার নাম। সেখানে দেখবেন- আল্লাহর মহান আউলিয়ায়ে কেরাম ধারাবাহিকভাবে বংশ পরম্পরায় ছিলেন। তাঁরা যে মহান ঐতিহ্য তথা তুরিকা আমাদেরকে দিয়েছেন- আমি সেই তুরিকার একজন খাদেম হিসেবে আপনাদের সামনে এসেছি চট্টগ্রাম থেকে। যাই হোক- সুরা আন নিসার ১২৩ নাম্বার আয়াত- তোমাদের আশার উপরে নয়, (তোমাদের মানে মুসলমানদের কথা বলা হচ্ছে) এবং আহলে কিতাবীদের আশার উপরেও নয়। অর্থাৎ তখন মুসলিমরা মনে করত যে, আমাদের কোন সমস্যা নেই, আমরা যা করছি সব ঠিক করছি। এগুলোর পুরস্কার আমরা নিশ্চিতভাবেই পাব। আর আহলে কিতাবীরা মনে করত তারা সব ঠিক করছে। এগুলোর পুরস্কার নিশ্চিতভাবেই পাবে। আমি সংক্ষেপে বলছি, এটা বেশ বড় ব্যাপার। কিন্তু কোরআন সেটার ফায়সালা দিচ্ছে- তোমাদের আশার ভিত্তিতেও নয়, আহলে কিতাবীদের আশার ভিত্তিতেও নয়, যে-ই মন্দ করবে সে-ই তার শাস্তি পাবে। এটা General। এই আয়াতের মধ্য দিয়ে আমাদের অযোগ্যতার আফালনের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে- আপনারা একটু চেক করে দেখবেন। ফিকহুতু তায়্যুশ এবং মাকাসিদুশ শরিয়ার সমন্বয়ে আত্মস্তরিতা পরিহার করে উম্মাহ যেন যোগ্যতা অর্জনে সর্বাঙ্গিক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে সফলতা অর্জন করতে পারে তার জন্য পরম করুণাময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা দরবারে আকুল ফরিয়াদ করছি। আমিন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালিন। আল্লাহ হাফেজ। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ্ জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত ৩৭ তম আন্তর্জাতিক শোহাদায়ে কারবালা মাহ্ফিলে রাহ্বারে আলম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান মাইজভাণ্ডারী (ম.)'র বাণী

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত
সুধীমণ্ডলী !

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

মুসলিম উম্মাহর বর্ষপঞ্জিকা নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহর মাহবুব
প্রিয়নবী (দ.)-এর হিজরতকে ঘিরে। হিজরতের কারণ এবং
পটভূমি অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আল্লাহর একত্ববাদ তথা
ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে মক্কাবাসীদের নানামুখী
ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, বাধা, নিপীড়ন সর্বোপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মুক্তির
পয়গাম ঘোষণাকারী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র জীবন হুমকির
মুখে পতিত হলে আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে
হিজরতের ঘোষণা আসে। হিজরত হচ্ছে নিজের জন্মভূমি,
বাস্তবতা, আত্মীয়-স্বজন, পরিচিত লোকালয়, সমাজ,
সভ্যতা, ভাষা-সংস্কৃতির বন্ধন এবং সম্পর্ক ত্যাগ করে
নিরাপত্তা এবং স্বীয় মতাদর্শ প্রকাশের সুবিধার্থে অনুকূল
পরিবেশে অন্যত্র অবস্থান গ্রহণ এবং বসবাস করা। প্রিয়নবী
(দ.) মক্কা ত্যাগ কালে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বেদনার্ত কণ্ঠে
কৃতজ্ঞচিত্তে বড় আফসোস রেখে জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসার
প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে যারা
সে সময় হিজরত করেছিলেন তাঁরা সকলে গৃহহীন নিঃসম্বল
অবস্থায়, আত্মীয়-স্বজনের মায়া-মমতায় ছেদ ঘটিয়ে মদিনায়
আগমন করেছিলেন। নিঃস্ব-নিঃসম্বল মানুষগুলোকে পরম
আত্মীয় হিসেবে সেদিন বরণ করেছিলেন মদিনার সাধারণ
জনগণ। এরপর মক্কা-মদিনার জনগণের বিশ্বাস চিন্তা-চেতনা
এবং ঐক্যের বন্ধনে সঞ্চিত এবং সমাদৃত শক্তির উপর মহান
আল্লাহর রহমতের সামিয়ানা ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র মক্কাবাসীর
আক্রমণ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয় ঈমান এবং আখলাকে
সমৃদ্ধ স্বল্পসংখ্যক মোমিনের সাহসী প্রতিরোধ যুদ্ধ 'জঙ্গে
বদরে'। এটি ছিল উম্মাহর ঈমান, আকিদাহ্ এবং তাওহীদের
ঝাঙা উর্ধ্ব তুলে ধরে পৃথিবীবাসীকে জানান দেয়ার মত
প্রকাশ্য বিজয়। বদর যুদ্ধে মুসলিম উম্মাহর বিজয় অর্জনের

মূলে ছিল- মহান স্রষ্টা, এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা অনন্ত
পরাক্রমশালী আল্লাহর প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন, পরম
সততা, দায়িত্ব এবং কর্মের পাশাপাশি মানবাধিকারের সযত্ন
সংরক্ষণ, সকল প্রকার কুটিলতা, সংকীর্ণতা, কুসংস্কার,
স্বার্থান্ধতা, মিথ্যাচার ও অসত্যের বিলোপ সাধন করে
তাওহীদের ঠিকানায় স্থিত থাকার অঙ্গীকার। বদর যুদ্ধের
বিজয়ের পর মক্কা থেকে বিতাড়িত মুসলিম উম্মাহ্ তখন
থেকে নিজস্ব বর্ষপঞ্জি গণনার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে
স্বতন্ত্র বিশ্বজনীন সভ্যতা এবং সাংস্কৃতিক উত্থানের ঘোষণা
দেয়। তাই হিজরী সন উম্মাহর জন্য বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে
বিজয় পতাকা উড্ডীনের প্রেরণাদীপ্ত মনন-মানসের অভিধান।
হিজরী সন প্রকৃত অর্থে নির্ঘাতক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সম্মুখ
লড়াইয়ে নির্ঘাতিত মানুষের বিজয় হিসেবে চিহ্নিত।

আমাদের নিকট হিজরী সনের প্রথম মাস মহররম আসে
স্মরণে এবং বরণে শোকের বার্তা নিয়ে। আল্লাহর প্রতি
নিঃশর্ত আনুগত্য, পরম সততা, দায়িত্ব-কর্তব্য নিষ্ঠা এবং
মানবাধিকার লালনের যে প্রতিশ্রুতি জঙ্গে বদরে আমাদের
বিজয় সুনিশ্চিত করেছিল ৬১ হিজরীর দশই মহররম কারবালা
প্রান্তরে উপর্যুক্ত অঙ্গীকার হারিয়ে যায় খোলাফায়ে রাশেদীনের
পর সম্পাদিত পারস্পরিক সন্ধিচুক্তি অস্বীকারে। সততার
পরিবর্তে শঠতা, সরল-সহজতার পরিবর্তে সংকীর্ণতা, সার্বিক
কল্যাণের পরিবর্তে স্বার্থান্ধতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে
অধিকার হরণ, স্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং পরামর্শমূলক
সিদ্ধান্তের পরিবর্তে স্বৈরাচার স্বৈচ্ছাচারী শক্তিমত্তার উত্থানের
বিরুদ্ধে পরিশুদ্ধ জীবনাচার, নৈতিকমান এবং মূল্যবোধ
উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঐশী তাগিদে প্রতিবাদ এবং
প্রতিরোধের মূলমন্ত্রে শাণিত আহলে বাইত হযরত ইমাম
হোসাইন (রা.)'র ফোরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে
উপস্থিতি হিজরীর প্রথম মাস মহররমকে করেছে শোক-
বিলাপ-অনুতাপ অনুশোচনায় দক্ষ। উম্মাহর মধ্যে তেজোদীপ্ত
কণ্ঠে মাতম উঠেছে "ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায়, হার
কারবালা কি বাদ"।

১০ মহররম কারবালা প্রান্তরে আহলে বাইতে রাসূল (দ.) হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) পরিবারের পুরুষ সদস্যসহ শঠতা, প্রবঞ্চনা এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে উম্মাহর নেতৃত্ব দখলকারী ইয়াজিদ বাহিনীর তলোয়ারের নিকট প্রচণ্ড সাহস এবং জজবা নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) শির দিয়েছেন, আমামা দেননি, শির নত করেননি। কারবালা প্রান্তরে আত্মত্যাগের মহান সাহসিকা হচ্ছে এক অনির্বাণ আদর্শ- যার নাম 'ইসলাম'। যে কোনো সশস্ত্র যুদ্ধে জয়-পরাজয় ক্ষণকালের। ক্ষমতার দাঙ্কিতা, অহমিকাও সাময়িক সময়ের। কিন্তু সত্যাদর্শের আবেদন অনন্তকালের। সত্যাদর্শ অমর, ঘুটঘুটে অন্ধকারে জোনাকির মত পথ দেখায়। দশ মহররম শোহাদায়ে কারবালার পটভূমি রচয়িতারা ইতিহাসের পাতায় ঘণ্য ভাষায় উচ্চারিত, নিন্দিত, অবজ্ঞায় অবহেলিত, আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত কুখ্যাত নাম। অন্যদিকে কারবালা-প্রান্তরে নির্যাতিত, পদপিষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় অসম্মানিত আহলে বাইতে রাসূল (দ.) এবং অনুগামীরা মহাসম্মানিত, গৌরবগাথায় নন্দিত সর্বত্র বরণ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিশ্ব ইতিহাসে সমাদৃত নাম। কারবালার শহীদানের সঙ্গে বেগবান হয়েছে ইসলামের মৌলিকত্বের জোয়ার। কারবালা প্রমাণ করে দিয়েছে আদর্শের মৃত্যু নেই।

মহান শাহাদাতে কারবালা স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আজকের পর্বে আতিথ্য গ্রহণে অসমর্থতার কারণে আমি ব্যথিত। আমি অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করি। আশা করি কারবালার শহীদদের আদর্শ আমাদেরকে সর্বাঙ্গীয় প্রেরণা যোগাবে, উদ্বুদ্ধ করবে ত্যাগের মহিমায়। ইসলামের আঙ্গিনা হবে সর্বপ্রকার কলুষতা-সংকীর্ণতা ভেদাভেদ মুক্ত হাজারো রকমারি ফুলের সমাহারে চির বিকাশমান সুরভিত পুষ্প উদ্যান। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের কল্যাণ করুন, আমীন।

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

সাজ্জাদানশীন, গাউসিয়া হক মন্জিল

এবং

ম্যানেজিং ট্রাস্টি, এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট,

দরবার-ই-গাউসুল আযম মাইজভাগুরী,

মাইজভাগুর শরিফ, চট্টগ্রাম।

সুফি উদ্ধৃতি

* “তিনি মু’মিন ব্যক্তি-যিনি ‘নফসে আম্মারা’কে দমন করার জন্যে সতর্ক প্রহরীরূপে দাঁড়িয়ে থাকেন। আর ‘আরিফ’ হচ্ছেন তিনি যিনি সর্বদা আল্লাহ তা’য়ালার দরবারে দণ্ডায়মান থাকেন”।

“অন্ধকার রাতে একটি কালো পাথরের উপর একটি কালো বর্ণের পিপীলিকার গতিবিধি যতটুকু গুণ্ড এবং অদৃশ্য আল্লাহ তা’য়ালার অস্তিত্ব মানুষের নিকট এর চাইতেও প্রচ্ছন্ন”।

- আওলাদে রাসূল (দ.) হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রা.)

* “উচ্চ মর্যাদা তালাশ করেছিলাম, বিনয়ের দ্বারা তা লাভ করেছি। সর্দারী তালাশ করেছিলাম, সত্যের মধ্যে তা পেয়েছি। গৌরব তালাশ করেছিলাম, দারিদ্র্যের মধ্যে তা পেয়েছি। অভিজাত্য তালাশ করেছিলাম, পরহেজগারীর মধ্যে তা লাভ করেছি। মহত্ব চেয়েছিলাম, অল্পে তুষ্ট থাকার মধ্যে তা লাভ করেছি। অপরের উপর নির্ভরশীল না হওয়ার কামনা করেছিলাম, খোদার উপর তাওয়াক্কুল করে তা লাভ করেছি”।

-হযরত ওয়াইস করণী (রহ.)

* যিনি আল্লাহ তা’য়ালাকে চিনতে পেরেছেন, তিনি নীরবতা অবলম্বন করেছেন।

- হযরত মেহাম্মদ ওয়াইস (রহ.)

* রাত্রি আসলে আমি বড়ই খুশি হই। কেননা রাত্রিকালে আমি নিরবচ্ছিন্ন নির্জনে থাকতে পারি। আবার ভোর হলেই আমি চিন্তিত হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, এখন লোকজন আসবে এবং আমাকে পেরেশানীর মধ্যে ফেলবে”।

“যে ব্যক্তি নিজেকে সম্মানিত বলে মনে করে, সে বিনয়রূপ মহামূল্য নেয়ামত হতে বঞ্চিত থাকে”।

দুনিয়ার মানুষের নিকট হতে প্রশংসা লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমলের প্রতি ভালবাসা ও অনুরাগ দেখান-রিয়াকারী। আর মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে নেক আমল করা-শিরক। এ দু’টি অবস্থা হতে আল্লাহ পাক তোমাকে রক্ষা করলেই বুঝতে হবে, তোমার মধ্যে এখলাস রয়েছে”।

- হযরত আবু আলী ফুযাইল ইবনে আয়ায (রহ.)

বেলায়তে মোত্লাকা নবম পরিচ্ছেদ

খাদেমুল ফোকারা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগারী (ক.)

আক্লে কুল্লি বা কুদসি সুনতুত্ব ও ধর্মসাম্য বেলায়তে মুহিত

আক্লে কুল্লি বা কুদসি:

যে স্তরে উন্নীত হয়ে মানুষ স্রষ্টা প্রভাবান্বিত সর্বজ্ঞানের অধিকারী হয়, সেই স্তরের জ্ঞানের নাম আক্লে কুল্লি বা কুদসি। এতে উলুহিয়াত বা উপাস্যবোধ ছাড়া আর কোনো ধরনের আদেশ-নিষেধ থাকে না। থাকে শুধু আল্লাহ নামের গুণবাচক প্রকৃতির বিকাশ। এই স্তরের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির রীতিনীতি, কাজকর্ম, শরিয়তের বা সাধারণ মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির গণ্ডিভুক্ত নাও হতে পারে। যেহেতু এটা বেলায়তের প্রভাবযুক্ত এবং এখানে নবুয়তে তশরিয়ী হুকুমের বিধানগত আদেশ, নিষেধ, প্রভাব সাময়িকভাবে রহিত। আক্লে কুল্লি বা কুদসি বেলায়তে খিজরির পর্যায়ভুক্ত। (২৪) মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি (র.) বলেন, “খোদার অবগতি সুফির অবগতিতে বিলীন হয়ে যায়, এটা কি মানবজাতি বিশ্বাস করবে?” (২৫) “আল্লাহ আল্লাহ বলতে বলতে মানব অস্তিত্ব যে আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যায়, মানব এটা কী করে বিশ্বাস করবে?” (২৬)

সুনতুত্ব ও ধর্মসাম্য:

মাওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী বলেন: “হে উপাস্য! প্রেমিকদেরকে পথ প্রদর্শন করো। এতোদিন খোদায়ী (প্রভুত্ব) করেছো, এখন পয়গাম্বর সিফতে (নবীর গুণে) তোমার প্রেমিকদেরকে পথ প্রদর্শন করো।” (২৭) অর্থাৎ ‘পয়গাম্বর’ খোদার সংবাদবাহক ও ‘পীর’, খোদাপরিচিত ব্যক্তি ‘মোরশেদ’ বা পথপ্রদর্শক রাহবারগণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ হেদায়েত এনায়েত (কৃপাময় দান) করো। উপরোল্লিখিত তিন স্তরের মানুষের জন্য স্তর ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নেতৃত্বের প্রয়োজন আছে। পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ, জাতি, সমাজ বা পরিবার নেই, যারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে নেতা বা শাসক হিসাবে মানে না। যে দেশ, যে জাতি বা সমাজে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব আছে, তারা উন্নত দেশ বা জাতি নয়। পক্ষান্তরে যারা উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীন, তারা উন্নত ও সম্মানিত। উপযুক্ত নেতৃত্বই প্রচ্ছন্নভাবে খেলাফতে-রব্বানি বা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব নামে অভিহিত। এই জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যার মধ্যে ব্যক্তিত্ব অর্জিত হয়েছে (ব্যক্তিত্ব বিরাজমান)। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকেই খেলাফতে-

উলুহিয়াত বলা হয়। এবং এরকম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিই নেতৃত্বের উপযোগী। কারণ এরকম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষেরাই উত্তেজনা পরিহার করেন, ধর্মসাম্যের উন্নয়ন করেন। এরকম নেতাই খোদা অনুসন্ধিৎসু মানুষের দিশারি।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা ‘ফাতাহ’-এর ১৬ থেকে ১৭ আয়াতের শেষ পর্যন্ত নেতৃত্বের বিরুদ্ধাচারী ও অনুগামীদের বিষয় উল্লেখ করে বলেছেন যে, সুনতুত্বাধীন সংগ্রামশীল মানবজাতির ভবিষ্যৎ অতি উত্তম। বিরুদ্ধাচারী, অলস, আয়েশী, বিলাসী ও সুনতুত্বহীন মানবের ভবিষ্যৎ অতি মন্দ ও দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত। ভয়ভীতি ও প্রলোভনের বশবর্তী জাতিরাই ‘মোয়াজ্জেব’ বা গজবের উপযুক্ত ও অভিশপ্ত। কোরআন পাকে বর্ণিত বিভিন্ন জাতির ইতিহাস তার সাক্ষী। উপরোক্ত আয়াত, পূর্ববর্তী নবীগণ, আখেরি নবী বা শেষ নবী ও তাঁদের অনুসারী এবং বিরুদ্ধাচরণকারীগণের প্রতি সমানভাবে প্রযোজ্য। যা আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ৬২, ৮৫ থেকে ১১২ ও ১১৩ আয়াতসমূহে এবং সূরা নিসার ১৩৬, ১৫২ ও ১৬২ আয়াতসমূহ দ্বারা প্রতিপন্ন (সমর্থিত) ও প্রমাণিত হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত আয়াত ১৯- (২৮) যেখানে “ইন্নাদ্দীনা এনদাল্লাহিল ইসলাম” শীর্ষক আয়াতের মর্ম অনুযায়ী একথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, যারা এই খোদায়ী নীতির ও নীতিবাহকের সঙ্গে মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে, তারা সনাতন (চিরন্তন) ইসলামের বিরোধী সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তাদের বিচার করবেন বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব প্রত্যেকের প্রতি এ বিষয়টি ওয়াজিব হয়েছে যে, যুগের নীতিবাহক নবী-অলি বা মোজাদ্দেদে-জমানদের নীতি মেনে চলা এবং তাঁদের নেতৃত্বাধীন থেকে নিজেকে মানবতার উচ্চ শিখরে উন্নীত করা। আবার নিজ বুঝ-ব্যবস্থাকে চরম সত্য মনে করে অন্যের আচরিত সত্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লিপ্ত হওয়াও উচিত নয়।

পবিত্র কোরআন পাকের সূরা ‘মায়দা’র আয়াত ৩৫-এ বর্ণনা আছে: “হে বিশ্বাসীগণ, খোদাকে ভয় কর। খোদার দিকে (যেতে) উপায় বা উসিলা তালাশ কর। আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টিত হও; তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।” (২৯)

বেলায়তে-মুহিত:

বেলায়তে-মুহিত বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত অর্থাৎ বেলায়তে মোতলাকার রীতিনীতি ও খোদায়ী নীতি অভিন্ন। এটা খোদার ইচ্ছাশক্তি সম্বৃত বস্তু (বিষয়)। এই বেলায়তের অধিকারী ও নীতিবাহক মোজাদ্দেদ জমান বা যুগ-সংস্কারক হচ্ছেন গাউসুল আযম শাহ সুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী মালামিয়া কাদেরী (ক.)। উপরে বর্ণিত কোরআন পাকের বাণীর মর্ম অনুসারে নৈতিক ধর্মপ্রধান আক্লে কুল্লির অধিকারী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন অলিআল্লাহ তিনি। তাসাওউফ অনুসারে তিনি কার্যকরী পস্থা অবলম্বনকারী। এটা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, কাজকর্ম ও কথাবার্তায় প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হয়।

সাম্যদর্শী হযরত গাউসুল আযম মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর জন্ম পৃথিবীর মধ্যস্থলে এবং যা কি না সাম্যধর্মী জাতি ঘেঁষা বা সাম্যধর্মী জাতি ও রাষ্ট্রের নিকটঘনিষ্ঠ। তাঁর আবাসভূমিও সাম্যের নিদর্শনযুক্ত ভূখণ্ড, যেহেতু এই আবাসভূমি পৃথিবীর মেরুরেখা সংলগ্ন। তিনি জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে 'তৌহিদে আদইয়ান' বা অদ্বৈত খোদা অনুরাগ মতবাদে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি আচার ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মকে প্রাধান্য দেন এবং পারস্পরিক আচার ধর্মে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য এবং শালীনতাকে সমর্থন করেন। খোদাস্মরণ ও নিজ সত্তার উন্নয়নের ব্যাপারে এবং বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতা, মানবতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে ব্যক্তি-সত্তার কল্যাণকর ভূমিকার সমর্থক ছিলেন। ছোট ছেলে-মেয়ে ও অসহায় মানুষকে সাহায্য-দানে তাঁকে ব্যস্ত দেখা যেতো। তিনি ধন-সম্পদের যে স্ফীতি, তার বিরোধিতার নীতিকে এবং অভাব-বিমুক্ত জীবন পছন্দ করতেন। কারো সাথে বিরোধ না বাড়িয়ে কিছু ত্যাগ স্বীকার করে হলেও সঠিক বোধবর্জিত অবুঝ মানুষের সঙ্গে আপস করার জন্য উপদেশ দিতেন। কোনো আলেম-ফাজেল-লায়েক মানুষের নাম উচ্চারণ করার সময় সম্মানবোধক ভাষা ব্যবহার করতেন। ছোটদেরকে স্নেহসূচক ভাষায় সম্বোধন করতেন। এজন্য প্রত্যেকেই মনে করতেন হযরত আকদাস (ক.) বুঝি তাকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, স্নেহ করেন। তিনি সব সময় পাক-পবিত্র বা অজু অবস্থায় থাকতেন এবং সুগন্ধি (খোশবু) ভালবাসতেন।

ধনঞ্জয় নামের তাঁর এক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভক্ত, জাহেরি জবানিতে (প্রকাশ্য উচ্চারিত ভাষায়) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, “তুমি তোমার ধর্মে থাকো, আমি তোমাকে মুসলমান করলাম।” হযরত আকদাস (ক.)

অন্য একদিন একজন হিন্দু মুসেফ বাবুকে বলেছিলেন: “নিজের হাতে পাকাইয়া (রান্না করে) খাও; পরের হাতে পাকানো খাইও না, আমি বারো মাস রোজা রাখি, তুমিও রোজা রাখিও।” সুফিদের পরিভাষা অনুসারে নিজের হাতে পাকানো বা রন্ধন কথাটির অর্থ হলো স্ব-অর্জিত জীবিকায় স্বাধীনভাবে জীবনযাপন এবং রোজা শব্দটির অর্থ হলো পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

ইসলাম ধর্ম প্রচারক খাজা কামালুদ্দিন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে (ঈসায়ী সনে) আজিজ মঞ্জিল, লাহোর থেকে প্রকাশিত তাঁর “রেসালা এশায়াতুল ইসলাম” গ্রন্থের ‘খলিফাতুল্লাহে আলাল আরদ’ প্রবন্ধে বলেন, দেখা যাচ্ছে মানবজাতি চেষ্টার মাধ্যমে একই নির্দিষ্ট স্থানের তালাশে মশগুল। চেষ্টার পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তির ব্যাপারে সবাই একমত। এই প্রবন্ধের ৩৪৯ পৃষ্ঠায় লেখক বর্ণনা করেন: “মরিয়মের পুত্র প্রথম ঈসানন, তাঁর আগে নিজেকে কোরবানিকারী (আল্লাহর জন্য আত্ম-উৎসর্গকারী) বহু ঈসা জন্মগ্রহণ করেছিলেন।” ঐ গ্রন্থের ৩৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে: “আত্মার বিশুদ্ধতার এবং পূর্ণমানবাত্মার জন্য খোদার স্বভাবে স্বভাবিত হওয়া অপরিহার্য কর্তব্য।” ঐ গ্রন্থের ৩৬১ পৃষ্ঠায় ‘ইসলাম ও থিওসফি’ শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে: “প্রকৃত সুফি তিনিই যিনি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীকে খোদার দিকে আহ্বান করেন।” (৩০)

মেশকাত শরিফের হাদিসে আছে: “প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তিই যিনি অন্য মুসলমানগণকে নিজের হাত ও জবানের (মুখনিঃসৃত কথার) কষ্ট থেকে নিরাপদে রাখেন।” (৩১)

সহায়ক গ্রন্থ:

ক. ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী অনূদিত ‘BELAYET-E-MUTLAKA’ (The Unchained Divine Relations or Unhindered Spiritual Love of God)’, ইংরেজি দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৭, প্রকাশনী: আঞ্জুমান-ই-মুত্তাবেয়িন-ই-গাউস-ই-মাইজভাণ্ডারী, চট্টগ্রাম।

খ. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান, সংকলন ও সম্পাদনা: মোহাম্মদ হারুন রশিদ, প্রথম প্রকাশ: জৈষ্ঠ্য ১৪২২/ মে ২০১৫, বাংলা একাডেমি, ঢাকা বাংলাদেশ।

“পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুননী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম: পরম ভাবমর্যাদা এবং শ্রদ্ধায় বিশ্বনবী (দ.) কে স্মরণ” দেশ জয় নয়: আদর্শের বিজয়ের অনুপম উপমা মক্কা বিজয় আলোকধারা প্রতিবেদন

এই ধরাধামে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র অবস্থান মাত্র তেষ্টি বছর। সুনির্দিষ্ট পার্থিব জীবনে তাঁর কর্ম পরিধি ছিল সুবিন্যস্ত, সুবিস্তৃত, সদা কল্যাণ অভিসারী, আদি, অন্ত এবং অনন্ত নির্দেশনামুখী। মহান আল্লাহর বিশ্ব পালননীতির অন্তহীন বিবর্তনধারা উপমা হিসেবে দৃশ্যমান হয়েছে বিশ্বনবী (দ.)'র পার্থিব জীবনের নানামুখী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন রাহ্মাতুল্লিল আলামীন অভিধায়। একই সঙ্গে তিনি ভীতি সঞ্চারকারীর দায়িত্বও প্রাপ্ত হয়েছিলেন। স্বীয় চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুহাম্মদ (দ.) উল্লেখ করেছেন, “আমি রহমত আকারে প্রেরিত হয়েছি এবং যুদ্ধ আকারেও”। মক্কায় অবস্থানকালে শৈশব-কৈশোরে তিনি সর্বত্র সম্বোধিত হয়েছেন সত্যবাদী, সৎকর্মশীল, শান্তিপ্ৰিয়, মিথ্যা পরিহারকারী, হাঙ্গামা বিমুখ সর্বোত্তম চারিত্রিক সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত ‘আল আমিন’ নামে। নবুয়ত প্রকাশের পর প্রতিবেশী আপনজনের প্রচণ্ড বাধা বিপত্তির মুখেও তিনি ছিলেন নৈতিক এবং চারিত্রিক বিশুদ্ধতায় অনন্য অতুলনীয় অপরাজিত। নবুয়তের বাণী প্রচারকালে মক্কা জীবনে অবহেলা, অবজ্ঞা, অবরোধ, দৈহিক আক্রমণ, বারংবার নির্যাতনের শিকার হয়েও কোন বাদ-প্রতিবাদ তিনি করেননি। এখানে শান্ত-সংযত বিশ্বাসে অটল, অবিচল দৃঢ়তায় তিনি ছিলেন উপমাবিহীন।

মক্কায় অবস্থানকালে অত্যাচার নির্যাতনের এক পর্যায়ে যখন তাঁকে হত্যার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হয় তখন হিজরতের প্রত্যাশে আসে। এ পর্যায়ে হযরত আলী (ক.)-কে স্বীয় পবিত্র বিছানায় সবুজ চাদরাবৃত অবস্থায় শুইয়ে রেখে আক্রমণকারীদের সামনেই তিনি গৃহ ত্যাগ করে হিজরতের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। দুর্গম গিরিখাদের দীর্ঘ মরু প্রান্তরে অগ্রসর হবার কালে একান্ত বিশ্বস্ত হিসেবে সঙ্গে নিলেন হযরত আবু বকর (রা.)-কে। বিশ্বনবী (দ.)'র জীবনে দৃশ্যমান এ দু'টি ঘটনায় সরাসরি সম্পৃক্ত দু'জনের মর্যাদা স্বতন্ত্র শিরোনামে সম্বোধিত হয়ে আছে। অবশ্য আজকের প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় এটি নয়।

মদিনায় অবস্থান গ্রহণের পর বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) ইসলাম ধর্মের শ্বাসত বাণী প্রচারের পাশাপাশি উম্মাহর শক্তিকে সাংগঠনিকভাবে সংহত করতে সচেষ্ট হন। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)'র গৃহে প্রতিদিন ইসলাম ধর্ম

গ্রহণের জন্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অসংখ্য মানুষের সমাবেশ ঘটতে থাকে। মানুষের একান্ত ইচ্ছা অভিপ্রায় হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত এবং প্রেরিত নবী (দ.)-কে স্বচক্ষে দেখা এবং বাণী শুনে আনুগত্য পেশ করা। এদিকে দিন দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন আর কারো গৃহে নয়, প্রয়োজন দেখা দেয় আল্লাহর প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য প্রকাশের জন্য ইবাদত কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত হয় মসজিদে নববী। যার অবস্থান মদিনা শরিফে। এ মসজিদই হয় মদিনা সাধারণতন্ত্রের প্রথম রাজধানী। এখানে সালাত এবং ইবাদতের পাশাপাশি হক্কুল ইবাদ হিসেবে মদিনার আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা চলত। স্বীয় জন্মভূমি মক্কার পরিবেশ-পরিস্থিতি হিজরত পরবর্তী মক্কাবাসীদের আচার আচরণ এবং অভিমত সম্পর্কে তিনি খবরা-খবর নিতেন। তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে নিয়োগ রাখতেন গুরুত্বপূর্ণ সাহাবায়ে কেলামকে। তদানীন্তন আরবের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র হচ্ছে রোমান সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত সিরিয়া তথা শামদেশ। মক্কাবাসীদের সিরিয়া গমনাগমনের মধ্যপথে মদিনার অবস্থান। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) মদিনা হিজরত করায় মক্কাবাসীরা তাদের বাণিজ্য বহরের চলাচল পথ অনিরাপদ ভাবে থাকে। এদিকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) হিজরতের পর মদিনায় বসবাসরত সকল ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে গড়ে তোলেন বহুত্ববাদী সমাজ কাঠামো ‘দৌলতুন মদিনা’। এটি সমকালীন সমাজ সংগঠন এবং ব্যবস্থাপনার চেয়ে অনেক অনেক বেশি প্রাথমিক। অন্যদিকে মক্কার অধিবাসীরা তখনো গোত্রীয় সংহতি এবং আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং স্থবির। সমাজ কাঠামোর এ ধরনের পরিস্থিতিতে মক্কাবাসীরা আবু জেহেলের নেতৃত্বে নিরাপদ পরিবেশে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র দৌলতুন মদিনা আক্রমণ করে। ফলে মদিনার নিরাপত্তা রক্ষার লক্ষ্যে আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে সংঘটিত হয় বদরের যুদ্ধ। পরপর সংঘটিত হয় ওহুদ, খন্দক প্রভৃতি সমর। অবশেষে বিশ্বনবী (দ.) পবিত্র কাবা তাওয়াফের বাসনা নিয়ে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। নিরস্ত্র অবস্থায় মক্কা অভিমুখে যাত্রা পথে হুদায়বিয়া নামক স্থানে মক্কাবাসী কর্তৃক বারিত হয়ে অবস্থান গ্রহণ করলে সেখানে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে আলোচনাক্রমে সম্পাদিত হয়

‘হুদায়বিয়ার সন্ধি’। পবিত্র কোরআনে এটিকে সম্বোধন করা হয়েছে ‘ফতহুম মুবিন’ সুস্পষ্ট বিজয় অভিধায়। এক কথায় মক্কাবাসী এই চুক্তির মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। মেনে নেয় মদিনা রাষ্ট্র শক্তির অবস্থানকে। অর্থাৎ এ চুক্তি সমকালীন বাস্তবতায় মক্কাবাসীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই মুসলমানদের সঙ্গে এক ধরনের ইতিবাচক ফয়সালা।

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদনের দুই বৎসরের মধ্যে কুরাইশরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করলে আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে সন্ধি অকার্যকর ঘোষণা দেন। এরপর বিশ্বনবী (দ.) অত্যন্ত গোপনে মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে দশ সহস্রাধিক সৈন্য নিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) জনভূমি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। অভিযান সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় থাকায় মক্কাবাসীদের যুদ্ধের কোন প্রস্তুতি ছিল না। মক্কার প্রবেশদ্বারে বিশাল বাহিনীর উপস্থিতি লক্ষ্য করে দিশেহারা কুরাইশ নেতারা ভীত-শংকিত অবস্থায় তখন নিরাপদ অবস্থানের সন্ধানে ব্যস্ত। রাতের নিস্তরকার মধ্যে মক্কাবাসীদের অবস্থান পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে দুই সহযোগীসহ গিরিপথে বের হয়ে পড়েন হযরত উমর ফারুক (রা.)। অন্ধকার রজনীর আবছায়ায় দেখলেন তিনজন মানুষ কী যেন অবলোকনে ব্যস্ত। অগ্রসর হয়ে হযরত উমর (রা.) দেখলেন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান তাদের মধ্যেই অবস্থান করছেন। হযরত উমর (রা.) তাকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করে হাজির করলেন বিশ্বনবী (দ.)’র সম্মুখে। ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু বন্দী হিসেবে নবীজী (দ.)’র পবিত্র পদপ্রান্তে সমর্পিত। তার শিরশ্ছেদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা.) হজুর (দ.)’র অনুমতি এবং নির্দেশ প্রার্থনা করলেন। মৃত্যুভয়ে শংকিত, হত-বিহ্বল আবু সুফিয়ানের চেহারা রক্তশূন্য পাণ্ডুর সদৃশ দেখে রহমতের নবী (দ.) করুণা সিক্ত হয়ে পড়েন। চাচা হযরত আব্বাস (রা.) এবং আবু সুফিয়ানের সঙ্গে কথোপকথনের এক পর্যায়ে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান হজুর (দ.) সমীপে সমর্পিত হয়ে ঈমান আনেন। মক্কার সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনা করে হযরত আব্বাস (রা.)’র পরামর্শে কাবা গৃহের পবিত্রতা এবং মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে বিশ্বনবী (দ.) কতিপয় নির্দেশনা জারী করেন। করুণাপ্রার্থীর পর ফ্যালফ্যাল নেত্রে তাকিয়ে থাকা আবু সুফিয়ানকে অতঃপর হজুর (দ.) বললেন, ‘আমার পক্ষে নগরময় ঘোষণা দাও মক্কা নগরীর অভ্যন্তরে মুসলমানদের প্রবেশ এবং অবস্থানকালে ক. যে অস্ত্র ত্যাগ করবে, খ. যে পবিত্র কাবা গৃহে প্রবেশ করে অবস্থান গ্রহণ করবে, গ. যে নিজের গৃহদ্বার বন্ধ করে রাখবে এবং বাইরে অবস্থান নেবে না এবং ঘ. যে আবু সুফিয়ানের ঘরে আশ্রয় নেবে, তারা সকলে মুসলিম বাহিনীর নিকট থেকে অভয়প্রাপ্ত এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

অভয়দান সম্পর্কিত উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত মুসলিম বাহিনীকে জানিয়ে দেয়া হয়। মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশ্যে কঠোর নির্দেশ জারী করা হয় যে, ‘নগরে প্রবেশকালে অথবা পরে কোন প্রকার অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে না, কারো প্রতি কোন প্রকার অসংযত আচরণ করা যাবে না। অতঃপর বিশ্বনবী উচ্চ স্থানে আরোহণ করে সেনা দলের কর্ম তৎপরতা অবলোকন করতে থাকেন। ইতোমধ্যে বিশ্বনবী (দ.)’র সিদ্ধান্ত আবু সুফিয়ান সরাসরি মক্কাবাসীদের অবহিত করে নিজে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন।

মহাবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.)’র নেতৃত্বে একটি সেনা দল ছিল। তারা যে পথ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন সে দিকে সূর্য কিরণে অস্ত্রের চমক দেখে রাসুলে খোদা (দ.) বিচলিত হয়ে পড়েন এবং কালবিলম্ব না করে হযরত খালিদ (রা.)-কে তলব করে কৈফিয়ত চান। হযরত খালিদ (রা.) তখন বলেন, নগরীতে প্রবেশকালে খান্দামা নামক স্থানে আবু জেহেলের পুত্র ইকরামার নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি দল বাধা দিলে দু’জন মুসলিম সৈন্য শহীদ হন। এই বাধা অতিক্রম করতে সংঘর্ষ চলাকালে শত্রু পক্ষের ত্রিশ জন নিহত হয়। মূলতঃ আকস্মিকভাবে এ যুদ্ধের সূচনা শত্রু পক্ষ করেছিল। সমস্ত ঘটনা শুনে বিশ্বনবী (দ.) বলেন, “আল্লাহ্‌র যা ইচ্ছে তাই সম্পন্ন হয়েছে”। আবু সুফিয়ানের মাধ্যমে অভয়বাণী শোনানোর পরও খান্দামা নামক স্থানে অতিক্রমিত আক্রমণের ঘটনা অবহিত হয়ে নবীজী (দ.) অনুধাবন করলেন যে, কুরাইশদের মধ্যে নীচাশয়তা- হঠকারিতা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। গুন্ডা-বদমাইশ প্রকৃতির বহুলোক জড়ো করে তারা মুসলমানদের অগ্রাভিযান প্রতিহত করতে গোপন পরিকল্পনা স্থির করেছে। এ ধরনের লোকেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, যদি গুন্ডা প্রকৃতির লোকদের প্রাথমিক বাধা সফল হয় তাহলে মক্কার বেশিরভাগ লোক তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে যোগদান করবে। আর যদি সফল না হয় তাহলে হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র অভয়দানের সদ্ব্যবহার করে আত্মরক্ষা করবে। এ ধরনের ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব ছিল ইকরামা, সাফওয়ান এবং সোহাইলের উপর। কুরাইশদের অহেতুক সৈন্য সমাবেশ পর্যবেক্ষণ করে বিশ্বনবী (দ.) মদিনার আনসার দলকে সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হতে আদেশ করেন। মুসলিম সেনা বাহিনীর তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি লক্ষ্য করে কুরাইশদের মধ্যে পুনঃ ব্যাকুলতা, শংকা এবং চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। আবু সুফিয়ান মুসলিম সেনা বাহিনীর বিচক্ষণতা এবং সমর প্রস্তুতি অবহিত হয়ে পুনরায় বিশ্বনবী (দ.) সমীপে করুণ আবেদন পেশ করলে তাকে অভয়বাণী অনুযায়ী কাজ করতে নির্দেশ দিয়ে বিদায় করেন।

মক্কা বিজয়ের সময় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) মহান স্রষ্টা

আল্লাহ্ রাক্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতাজনিত ফরিয়াদ পেশ করে তাঁর উষ্ট্র কাসওয়ার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন। অতঃপর বিজয়ী বেশে কাদা নামক স্থান অতিক্রম করে প্রিয় জন্মস্থান মক্কায় প্রবেশ করেন। মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর পবিত্র মস্তক উন্নত রাখেননি। মহান আল্লাহ্র প্রতি আপন দীনতা প্রকাশ করে অত্যন্ত বিনয়ে মস্তক অবনত করে অগ্রসর হন। পৃথিবীতে কোন বিজয়ী চির বৈরীদের উপর বিজয়ী হলে পাত্র মিত্র অমত্যবর্গ পরিবেষ্টিত হয়ে গৌরব গাথা বয়ান করে দম্ভ-গম্ভীর উদ্ধত শিরে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বিজিত এলাকায় প্রবেশ করেন। রাজা-বাদশাহদের রাজ্য জয় বিষয়ে সাবাবের রাণী বিলকিসের ভাষায় পবিত্র কুরআনের সূরা আন নমল'র ৩৪ নং আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে, “বাদশাহ্ যখন কোন গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে পূর্বের সব কিছু বিধ্বস্ত করে ফেলেন”। অথচ তাওহীদের বাণী তথা সত্যধর্ম ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে মক্কাবাসীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়ে যে মহান রাসুলে রাক্বিল আলামীন বিজয়ী বেশে জন্মভূমিতে প্রবেশ করেন তাঁর বিনম্রতার কোন উপমা পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। মক্কা নগরীর বিভিন্ন প্রবেশ পথ দিয়ে সেনাপতিরা স্ব-স্ব বাহিনী নিয়ে প্রবেশ করে চলেছেন। সবশেষে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের শ্রেষ্ঠ মানব প্রবেশ করছেন নগরীর দিকে। নিজস্ব বাহন কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে যাত্রাকালে কথিত অভিজাত হিসেবে পরিচিত কাউকে নেননি। তাঁর পশ্চাতে বসিয়েছেন যাদের পুত্র উসামাকে। কোন প্রথিতযশা বীর সেনাপতি অথবা মক্কাবাসীর নিকট সু-পরিচিত কাউকে তাঁর উষ্ট্রে সওয়ার করেননি। যতোই তিনি মক্কা নগরীর নিকটবর্তী হচ্ছেন ততোই বিনয়ভাবে নুয়ে পড়ছেন। তাঁর পবিত্র মস্তক এতোই অবনত হয়েছে যে, ক্রমে ক্রমে তাঁর শির পালানের কাঠি স্পর্শ করে। ফলে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল অদৃশ্য হতে থাকে। তাঁর পবিত্র চেহারায় বিন্দুমাত্র গৌরবের স্পর্শ নেই বরং লাজুকতা এবং বিনম্রতার অমলিন চমকে মহানুভবতার অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করে কুরাইশ দলপতি, সম্ভ্রান্ত এবং সাধারণ মানুষের মস্তক নত হয়ে পড়ে।

মক্কা নগরীতে পৌঁছে বিশ্বনবী (দ.) পবিত্র কাবা গৃহে প্রবেশ করেন। পবিত্র গৃহে অনেকদিন ধরে রক্ষিত মূর্তিগুলো অপসারণ এবং সকল প্রকার পৌত্তলিক আচার সংস্কৃতি ধুয়ে মুছে শোকরিয়া আদায় করেন। অতঃপর মক্কাবাসীদের সম্মুখে উপস্থিত হলে অনুশোচনায় দক্ষীভূত জনগণ তাদের ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্ত অবহিত হতে চান। রাসুলে খোদা (দ.) তাদের মতামত জানতে চাইলে তারা করুণ নিবেদনে নিজেদের প্রতিহিংসাপ্রবণ কার্যাবলির প্রতিফল সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে অদৃষ্টের কথা ভাবছে বলে অবহিত করে। স্বজাতি এবং স্বদেশবাসীর অসহায়ত্ব অবলোকন করে বিশ্বনবী (দ.) অত্যন্ত সহৃদয়তা প্রদর্শন করে

নির্যাতক ভাইদের প্রতি হযরত ইউসুফ (আ.)'র করুণা প্রদর্শনের বিষয় উল্লেখ করে উচ্চারণ করেন, “তোমাদের বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদের পাপ এবং স্বলন ক্ষমা করুন। কেন না তিনি অপার করুণাময় এবং সকলের চেয়ে অধিকতর করুণাময়”-(সূরা ইউসুফ: ৯২)। অতঃপর হাসিমুখে বিশ্বনবী (দ.) বলেন, “আজ তোমাদের প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই। তোমাদের সব অপরাধ ক্ষমা করলাম। তোমরা স্বাধীন। তোমাদের প্রতি একত্ববাদের দাওয়াত পেশ করা হলো, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে আমার আহ্বান বিষয়ে অথবা তোমাদের অতীত ধর্মাচার পালন কোনটি মঙ্গলজনক তা নির্ধারণের স্বাধীনতা তোমাদের উপর অর্পিত হলো”। বিশ্বনবী (দ.)'র উপর্যুক্ত আহ্বানের নৈতিক এবং অতিপ্রাকৃতিক তেজস্বিতা সমবেত মক্কাবাসীর বিবেচনায় প্রচণ্ড আত্ম জাগরণের সঞ্চার করে। সমবেত কণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ধ্বনি উঠে, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ্”। এর পরই তিনি খন্দামা এলাকায় হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীকে বাধা প্রদানে নেতৃত্বদানকারী ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, সাফওয়ান এবং সোহাইল সম্পর্কে অবহিত হয়ে লুকিয়ে থাকা সোহাইল, পলায়নরত সাফওয়ান ও ইকরামাকে ক্ষমা প্রদর্শনের ঘোষণা দেন। ইসলাম ধর্মের প্রধান শত্রু আবু জেহেলের পুত্র যখন কালেমা পাঠের উদ্দেশ্যে বিশ্বনবী (দ.) সমীপে আগমন করছে তখন তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে বলেন, “আবু জেহেল পুত্র ইকরামা আসছে একজন মুসলমান হিসেবে। তোমরা তার পিতার নামে কোন কটুবাক্য উচ্চারণ করো না”। মক্কা বিজয়ের এ সকল দৃশ্যপটে উদ্ভাসিত হয়েছে মানবতার ঐশী বিধান। মক্কা বিজয় কোন দেশ বিজয় নয়- এটি আল্লাহ্ নির্ধারিত বিধান ইসলামের বিজয়। এক অনুপম আদর্শের বিজয়। এই আদর্শের মর্মদোলায় ধ্বনিত হয়েছে সাধারণ ক্ষমা।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সাধারণ ক্ষমার আরেকটি উদাহরণ এ নিবন্ধে উল্লেখের দাবী রাখে। সূরা কাহাফে বিশ্ব বিজয়ী জুলকারনাইন প্রসঙ্গে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিষয়টি উল্লেখ আছে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বেই জুলকারনাইনকে হত্যার পরিকল্পনা নেয় তাঁর মাতামহ তথা সম্রাট আস্টাগিস। কারণ রাজ-জ্যোতিষী আস্টাগিসকে তার পরাজয় এবং পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করে জানায় যে, দৌহিত্রের হাতেই তার নিশ্চিত পরাজয় ঘটবে এবং রাজ্যহারা হবে। এই দৌহিত্র এখন মাতৃগর্ভে রয়েছেন। সম্রাট আস্টাগিস জ্যোতিষির ভাষ্য জ্ঞাত হবার পর পর দৌহিত্রকে হত্যার গোপন পরিকল্পনা করে। আস্টাগিস গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয় প্রধানমন্ত্রীর উপর। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নবজাতকের দীপ্যমান চেহারা দেখে সম্রাটের পরিকল্পনা

বাস্তবায়ন না করে জুলকারনাইনকে প্রতিপালনের জন্যে অতিসংগোপনে জঙ্গলে পাঠিয়ে দেন। সেখানে তিনি এক পর্যায়ে সন্ন্যাসী যরদশতের আশ্রয়ে লালিত হয়ে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেন। যরদশত হলেন তাওহীদবাদী গ্রন্থ “আবেস্তা” তথা যিন্দাবেস্তা গ্রন্থের প্রবর্তক। জীবন সংগ্রামের এক পর্যায়ে সীমাহীন স্বার্বভৌমত্বের অধিকারী মহান আল্লাহ্ অতুল্য-অকল্পনীয় ইচ্ছাশক্তির করুণাসিক্ততায় জুলকারনাইন বিশ্বজয়ে বেরিয়ে পড়েন। পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধব্যাপী বিজয় অভিযান শেষে পশ্চিম দেশ করতলগত হবার পর আল্লাহ্র নির্দেশ আসে, “হে জুলকারনাইন, এই জাতি এখন তোমার করতলগত হয়েছে। তুমি এখন যেভাবে ইচ্ছা তাদের সাথে ব্যবহার করতে পার। ইচ্ছা হলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পার অথবা বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে পার। সে (জুলকারনাইন) ঘোষণা করল, আমি অতীতের অপরাধের জন্যে কাউকেই শাস্তি দিতে চাইনা। আমার পক্ষ হতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা দান হলো। অবশ্য ভবিষ্যতে যদি কেউ কোন অপরাধমূলক কার্য করে নিশ্চয় আমি তাকে শাস্তিদান করব। তদুপরি তাকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। সেখানেও স্বীয় প্রভুর নিকট হতে তাকে শাস্তিবরণ করতে হবে। বরঞ্চ যে আমার বিধান মেনে চলবে এবং সৎ লোক বলে প্রমাণিত হবে তার জন্যে যথাযোগ্য পুরস্কার রয়েছে। সে আমার আইন-কানুন খুবই সহজ দেখতে পাবে” (সূরা কাহাফ: ৮৬-৮৮)। উল্লেখ্য যে, জুলকারনাইনের সাধারণ ক্ষমার আওতায় তাঁর মাতামহ এবং নির্যাতক আস্টাগিসও ছিলো। পবিত্র কুরআন এভাবে জনমন জয় করে হিংসা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধ এবং রক্তপাতকে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহিত করে মহান আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং রবুবিয়াতকে প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা দিয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পর নির্যাতক, অত্যাচার প্রতিপক্ষের প্রতি সাধারণ ক্ষমার মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (দ.) বিশ্ব ইতিহাসে যে নান্দনিক অধ্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন এর কোন তুলনা নেই। পৃথিবীর সমাজ পরিবর্তন এবং বিকাশ ধারার ইতিহাস অসংখ্য বিপ্লব এবং বিজয়ের দুনিয়া কাঁপানো ঘটনার লিপিতে অগণিত খণ্ডে গড়ে উঠেছে। অতীত ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জী পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, রোমান পারস্য গ্রীক সাম্রাজ্যের পৃথিবীখ্যাত অধিশ্বররা যখন রাজ্য জয়ে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন সেখানে ধ্বংস, মৃত্যু, রক্তস্রোতে জনপথে মহাপ্লাবন ঘটেছে। ভারত বর্ষের ইতিহাসে সম্রাট অশোক ত্রুর ক্ষেত্রে সোয়া লক্ষ সৈনিকের মৃতদেহ দেখে মনোবেদনায় বিমর্ষ-শোকাভিভূত হয়ে অহিংস নীতিতে আনুগত্য প্রকাশ করে ধর্মান্তরিত হন। ফেরাউন, বখতে নাসার, আলেকজান্ডার, হালাকু, চেঙ্গিসদের ধ্বংস লীলার পেছনে ছিল ক্ষমতা এবং পররাজ্য গ্রাস। আধুনিক পৃথিবীর উন্মেষের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অসংখ্য বিপ্লব-বিদ্রোহের ইতিহাস। ফ্রান্সে

সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার স্লোগানে রক্তাক্ত বিপ্লবের পর প্রতিপক্ষ নির্মূলের লক্ষ্যে যে প্রতিশোধ স্পৃহা দানবীয় ধারার সৃষ্টি করেছে তাতে বিপ্লবের মূলবাণীই সমাহিত হয়েছে। পরপর সতেরবার বিপ্লবের পর বিপ্লব করেও সেখানে মুক্তির ঠিকানা রয়েছে অনির্ধারিত। রাশিয়া এবং মহাচীনের বিপ্লব শতাব্দী ধরে পৃথিবীর যুব মানসে বিপ্লবের স্পৃহা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও রুশ বিপ্লব এবং চীন বিপ্লবের পর শ্রেণি শত্রু খতমের নামে যে হারে প্রতিপক্ষকে নির্মূলের আয়োজন হয়েছে তাতে আদর্শ প্রতিষ্ঠা দূরে থাক, নিজেদের ভৌগলিক সীমানা পর্যন্ত এখনো অমীমাংসিত হয়ে আছে। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশকে কম্বোডিয়ায় বিপ্লব সম্পন্ন হবার পর বিজয়ীদের পরিকল্পিত প্রতিশোধ এবং গণহত্যার কারণে বিজয়ীরা আসামীর কাটগড়ায় দাঁড়িয়েছে। এক কথায়- ‘আদর্শ’ মানুষের জন্যে গাইড লাইন; মানুষ আদর্শের জন্যে নয়। আদর্শ চাপিয়ে দেয়া যায় না বরং আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত উদ্বোধনে মানুষ স্বেচ্ছায় আদর্শকে ধারণ করে নেয়। মক্কা বিজয় পৃথিবীবাসীকে অন্ততপক্ষে এতটুকু শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছে।

মক্কা বিজয়ের পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা বিশেষত মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহনকারী আনসার নেতা সাদ বিন ওবাদার কণ্ঠে অত্যাচারে মক্কাবাসীর প্রতি ত্রাস সৃষ্টির ভয় দেখানোর কারণে পতাকা কেড়ে নিয়ে হযরত আলী (ক.)’র নিকট অর্পণ করায় প্রমাণিত হয়েছে ইসলাম সামরিক অভিযানমুখী জয়-পরাজয়ের ধর্ম নয়। ইসলাম রাজা, বাদশাহ, সম্রাট, সাম্রাজ্য-রাজ্য নির্ভর ধর্ম নয়, বরং ইসলাম বিশ্বের যেকোন অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আত্মিক এবং জাগতিক মুক্তির সুস্পষ্ট পয়গাম নির্দেশকারী ধর্ম। মক্কা বিজয় আরেকটি বিষয় স্পষ্ট করেছে যে, ইসলাম জাতি-বর্ণ-ধর্ম গোত্রীয় কলহ-বিবাদ-হিংসা-বিদ্বেষ-প্রতিশোধ লালনের দানবীয় হুকুম পালনের জন্যে প্রবর্তিত হয়নি, বরং এগুলো বিনাশের জন্যে ঐশী নির্দেশনা নিয়ে প্রবর্তিত হয়েছে। মক্কা বিজয় পরবর্তী বিশ্বনবী (দ.)’র সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাসহ সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিটি মানুষের জন্যে হিংসা-বিদ্বেষ প্রতিশোধ, ভয়ভীতি মুক্ত মানব সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা গড়ার লক্ষ্যে সুচিন্তিতভাবে ঘোষিত হয়।

মক্কা বিজয় পূর্বাপর ঘটনায় হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র ব্যক্তিত্বের চরম বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় এভাবে, “মুহাম্মদ কো খোদা মত্ কহো, মুহাম্মদ খোদা নেহি, লেকিন মুহাম্মদছে খোদা জুদা নেহি”। সহজ কথায় আল্লাহ্র প্রকৃতি এবং আদর্শ মুহাম্মদ (দ.)’র মধ্যে বিকশিত এবং প্রকাশিত হয়েছে। এ কারণে মক্কার সকলকে যে কোন শাস্তি প্রদানের মতো পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিশ্বনবী (দ.) মহান স্রষ্টার অব্যবহৃত দয়াগুণের প্রকৃতি ধারণ করে “সাধারণ ক্ষমা”কে শাস্তি, সদ্ভাব এবং স্থিতির পূর্বশর্ত হিসেবে বাস্তবায়ন করেছেন।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত মাইমুনা বিন্তে হারিস (রা.)

মোহাম্মদ গোলাম রসুল

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আল্লাহ তা'য়ালার মহব্বত ও সন্তুষ্টি একমাত্র তাঁর অনুকরণ ও অনুসরণের মধ্যে নিহিত বলে কুরআনে পাকে ঘোষিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র-পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যমের প্রথম বাহক হলেন সাহাবায়ে কিরাম (রা.)। মহানবী (দ.)-এর বিবিগণ মহিলা সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এমনি একজন মহিলা সাহাবী ছিলেন হযরত মাইমুনা বিন্তে হারিস (রা.)।

প্রকৃত নাম ছিল 'বাররাহ'। রাসূলুল্লাহ (দ.)-এর সঙ্গে শুভ পরিণয় হওয়ার পর মাইমুনা নাম রাখা হয়। কায়েস বিন আইলান গোত্রের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর নসবনামা হল মাইমুনা বিন্তে হারিছ বিন হাযান বিন বুজাইর বিন হাযাম বিন বাওয়াতা বিন আবদুল্লাহ বিন হীলাল বিন আমের বিন ছা'ছা বিন মাবিয়া বিন বকর বিন হাওয়ায়েন বিন মানসুর বিন আকরামা বিন খাসিফাতা বিন কায়েস বিন আইলান বিন মুদির।

তাঁর মাতার নাম ছিল হিন্দ বিনতে আওফ বিন জুহায়ের বিন হারিছ বিন হুমাতাতা বিন জারাশ। তিনি হামির গোত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন।

হযরত মাইমুনা (রা.)-এর প্রথম বিয়ে হয়েছিল মাসুউদ বিন আমর বিন উমায়ের সাকাফীর সাথে। কোন কারণে তিনি তালাক দিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর আবু রুহম বিন আবদুল উজ্জার সাথে দ্বিতীয় বিয়ে হয়। সপ্তম হিজরীতে সে স্বামী মারা যায় এবং হযরত মাইমুনা বিধবা হন।

একই বছরে নবী করিম (দ.) ওমরা আদায়ের জন্য মদিনা থেকে মক্কা রওনা হন। এ সময় তাঁর শ্রদ্ধেয় চাচা হযরত আব্বাস (রা.) হযরত মাইমুনা (রা.)-এর সাথে কথা বলেন। নবী করিম (দ.) এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। বস্ত্রত ইহরাম অবস্থাতেই সপ্তম হিজরীর শাওয়াল মাসে পাঁচশ দিরহাম মোহরের বিনিময়ে হযরত মাইমুনা (রা.)'র সাথে নবী করিম (দ.)-এর শাদী হয়। ওমরাহ পালন শেষে মক্কা থেকে ১০ মাইল দূরে ছারফ নামক স্থানে নবী করিম (দ.) অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর গোলাম হযরত আবু রাফে (রা.) হযরত

মাইমুনা (রা.) কে সাথে নিয়ে সেখানে এলেন এবং সেখানেই উরুসের রসম আদায় হয়। তাঁর সাথে শাদীর পর নবী করিম (দ.) বেছাল প্রাপ্তি পর্যন্ত আর কোন শাদী করেননি।

হযরত মাইমুনা (রা.) অত্যন্ত মুত্তাকী এবং আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণকারী মহিলা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন “মাইমুনা (রা.) আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণকারী এবং আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ছিলেন”।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'য়লা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই দ্বীনকে পূর্ণতা দেন। এরপর আল্লাহ দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অর্পণ করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি হুকুম হলো, “তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান কর, অসৎ কাজে নিষেধ কর এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর” (সূরা: আলে ইমরান-১১০)। “বলুন (হে নবী) এটাই আমার পথ, মানুষকে আমি সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে ডাকি; এবং আমার অনুসারীরাও” (সূরা: ইউসুফ-১০৮)।

একবার মদিনায় একজন মহিলা কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তিনি মান্নত করেন যে, যদি আল্লাহ পাক সুস্থ করেন তবে তিনি বাইতুল মোকাদ্দাসে গিয়ে নামায পড়বেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সুস্থ করলেন এবং তিনি তাঁর মান্নত পুরো করার জন্য বাইতুল মোকাদ্দাস গমন করতে ইচ্ছা করলেন। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে হযরত মাইমুনা (রা.)-এর কাছে বিদায় নিতে এলেন এবং সকল ঘটনা খুলে বললেন। হযরত মাইমুনা তাঁকে বুঝালেন যে, মসজিদে নববীতে নামায পড়ার সওয়াব অন্য মসজিদে নামায পড়ার সওয়াব থেকে হাজার গুণ বেশি। তুমি বাইতুল মোকাদ্দাসে যাওয়ার পরিবর্তে মসজিদে নববীতে নামায পড়ে নাও। সওয়াব বেশি হবে এবং মান্নত পূরণ হবে। কেন না আল্লাহর কাছে বাইতুল মোকাদ্দাসের চেয়ে এটা বেশি প্রিয়।

একদিন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) উশ্কো খুশ্কো ও অবিন্যস্ত চুল সমেত হযরত মাইমুনা (রা.)-এর খেদমতে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “বেটা, চুল অবিন্যস্ত কেন?” হযরত আবদুল্লাহ (রা.) বললেন, “আমার স্ত্রী

‘দিনগুলিতে’ রয়েছে। সে আমার মাথায় চিরুণী করে। কিন্তু এখন এ অবস্থায় তাকে দিয়ে কাজ করানো ঠিক মনে করিনি।” হযরত মাইমুনা (রা.) বললেন, “হে পুত্র, তা কি কখনো অপবিত্র হয়? আমাদের এ অবস্থায় রাসূলে করিম (দ.) আমাদের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন এবং কুরআন পড়তেন। আমরা ঐ অবস্থায় মুসল্লা নিয়ে মসজিদে আসতাম।” অন্য আরো একবার তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বুঝিয়েছিলেন যে, মহিলাদের ঐ অবস্থায় স্পর্শ করায় কোন জিনিস অপবিত্র হয় না।

একবার হযরত মাইমুনা (রা.)-এর একজন নিকটাত্মীয় তাঁর খেদমতে হাজির হলো, তার মুখ দিয়ে শরাবের গন্ধ বের হচ্ছিল। তিনি খুব ক্রোধান্বিত হলেন এবং কঠোর ভাষায় বললেন “খবরদার! ভবিষ্যতে কোনদিন আমার ঘরে প্রবেশ করবে না”।

একবার তিনি একজন বাদীকে আল্লাহর রাস্তায় আযাদ করে দিলেন। নবী করিম (দ.) জানতে পেরে বললেন, “আল্লাহ তোমাকে সওয়াব দিন”।

হযরত মাইমুনা (রা.) কল্যাণকামী এবং দানশীল মহিলা ছিলেন। এ ধরনের দরাজদিলের কারণে মাঝে মধ্যে তাঁকে ঋণও করতে হতো। একবার বিরাট অংক ঋণ নিলেন। একজন জিজ্ঞেস করলেন, “উম্মুল মুমিনীন, এতবড় অংক পরিশোধের ব্যবস্থা কি হবে?” তিনি বললেন, “আমি রাসূলে পাক (দ.) থেকে শুনেছি, যে ব্যক্তি ঋণ আদায় করার নিয়ত রাখে আল্লাহ তাঁর ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন”।

হযরত মাইমুনা (রা.) ৫১ হিজরীতে ছারফে ওফাত করেন। যখন জানাযাহ উঠানো হলো তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) বললেন, “জানাযাহ বেশি নাড়াচাড়া দিওনা। তিনি রাসূলে পাক (দ.)-এর জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। আদবের সাথে আস্তে আস্তে চলো।”

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) জানাযাহ-নামায পড়ালেন এবং তাঁকে কবরে রাখলেন।

হযরত মাইমুনা (রা.) থেকে ৪৬ টি হাদিস (অন্যমতে ৭৬ টি) বর্ণিত আছে। তাঁর হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.), আবদুল্লাহ বিন শাদাদ (রা.), আবদুর রহমান বিন সায়েব (রা.), ওবাইদুল্লাহ খাওলানী (রা.) এবং আতা বিন ইয়াসার (রা.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল (রা.)

হযরত মাইমুনা (রা.)-এর সহোদরা ছিলেন।

সারাবিশ্বের সকল মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও সফলতা রয়েছে দ্বীনের মাঝে। দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’য়ালার হুকুম (আদেশ-নির্দেশ, করণীয়-বর্জনীয়) এবং বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অর্থাৎ আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’য়ালার প্রদত্ত ও রাসূল (দ.) প্রদর্শিত পথেই মানবতার মুক্তি ও শান্তি। এ ছাড়া অন্যকোন পথ, মত, চিন্তা-চেতনায় মানুষের সুখ শান্তি ও সফলতা নেই।

তথ্যসূত্র: ১. কুরআন শরিফ, ২. দুইশত জন মহিলা সাহাবী ও বেহেশতী রমণীগণ, মোসাম্মৎ আমেনা বেগম, ঢাকা এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৩৮ বাংলা বাজার, ঢাকা। ৩. ঈমান আমল ইলম, ড. ইবনে আশরাফ, রিমঝিম প্রকাশনী, ৪৫ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। ৪. হায়াতুস সাহাবাহ, মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ ছাহেব কান্ধলভী (র.), দারুল কিতাব, ৫০ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

সুফি উদ্ধৃতি

হযরত রাবেয়া বসরী (র.) একবার রোগাক্রান্ত হলে তাঁকে রোগের কারণ জিজ্ঞাস করা হয়। জবাবে তিনি বলেন, “আজ প্রাতঃকালেই আমার মন যখন বেহেশতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল, তখন আমার দোস্ত আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন এবং আমাকে কিছু তিরস্কার করেন। সেই তিরস্কার আমার রোগের কারণ”।

“আমার পক্ষে বেহেশত ও দোযখ উভয়ই সমান। কেননা, তাঁর ইবাদত করা তো এমনি আমার প্রতি ফরযে আইন। আচ্ছা বলুন তো যদি বেহেশত এবং দোযখ না থাকত, তবে কি আমরা তাঁর ইবাদত করতাম না? আর খোদা তা’য়ালার কি এমন উপযোগী নন যে, কিছুর মাধ্যম ব্যতীত আমরা তাঁর ইবাদত করি। অর্থাৎ শান্তির ভয় কিম্বা নেয়ামত ও আরামের আশা না করে থাকলেও কি তাঁর এমন গুণ নাই যে, যার কারণে তাঁর ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য হয়”।

- হযরত রাবেয়া বসরী (রহ.)।

আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র তাসাওউফ জগৎ অধ্যাপক জহুর উল আলম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)

আল্লামা জুরযী তাঁর 'হিসনে হাসীন' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, “রাসুলে পাক (দ.) হযরত আলী (ক.) এবং হযরত ফাতিমা (রা.)'র বিয়ে পড়াবার পর স্বগৃহে প্রবেশ করলেন। হযরত ফাতিমাকে (রা.) পানি আনতে বললেন। হযরত ফাতিমা (রা.) কাঠের পেয়ালাতে পানি নিয়ে এলেন। রাসুলে পাক (দ.) ওই পানিতে মিশিয়ে দিলেন তাঁর পবিত্র মুখের লালা। অতঃপর ফাতিমাকে বলেন “কাছে এসো”। তিনি কাছে এলে ওই পানি হুজুর (দ.) ছিটিয়ে দিলেন ফাতিমার পবিত্র বক্ষের মাঝখানে। বললেন, “হে আমার আল্লাহ! আমি আমার এ কন্যাকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের প্রভাব থেকে আপনার আশ্রয়ে দিয়ে দিলাম”। তারপর বললেন, “পুত্রী! আমার দিকে পিঠ ফিরাও। তিনি (ফাতিমা) পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। রাসুলে পাক (দ.) তখন পানি ছিটিয়ে দিলেন তাঁর দুই কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানে। বললেন, হে আমার আল্লাহ! আমি একে এবং এর সন্তানদেরকে বিতাড়িত শয়তানের কুদৃষ্টি থেকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম”। তারপর বললেন, “আরো কিছু পানি আনো”। হযরত আলী (ক.) বলেন, “এ কথা শুনে আমি বুঝে ফেললাম, এবার হুজুর (দ.) কী করবেন”। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং পানি নিয়ে এলাম। বিশ্বনবী (দ.) ওই পানিতেও তাঁর পবিত্র মুখের লালা মেশালেন। তারপর বললেন, “সামনে এসো”। আমি (আলী) তাঁর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি আমার মাথায় ও মুখে পানি ছিটিয়ে দিলেন। দোয়া করলেন, “আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা ওয়া যুররিয়াতিহি মিনাশ্ শাইত্বানির রাজীম”। তারপর বললেন, “বিস্মিল্লাহি ওয়া বারাকাতিহি”। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, বিয়ের দিন রাসুলে পাক (দ.) এশার নামাযের পর হযরত ফাতিমাকে নিয়ে হযরত আলী (ক.)'র গৃহে যান। তারপর এক পেয়ালা পানি চেয়ে নিয়ে তাতে মিশিয়ে দেন তাঁর পবিত্র মুখের লালা। পাঠ করেন সূরা নাস, সূরা ফালাক এবং আরো কিছু দোয়া। হযরত আলী (ক.)-কে বললেন, “পান করো” তারপর হুজুর (দ.) ওজু করলেন। হযরত ফাতিমা (রা.)-কে বললেন, “তুমি এই পানি পান করো”। এরপর হুজুর (দ.) পুনরায় ওজু করলেন। অতঃপর বললেন, “হে আমার আল্লাহ, এ দুটি প্রাণ আমার এবং আমিও তাঁদের। হে আমার রব, যেভাবে আমাকে পবিত্র করেছো, সেভাবে তুমি এদেরকেও পবিত্র করো। তারপর দু'জনকে (আলী এবং ফাতিমা) লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা

তোমাদের শয়ন কক্ষে যাও।” তিনি আরো দোয়া করলেন, “হে আমার আল্লাহ, দু'জনের মধ্যে মহব্বত সৃষ্টি করে দাও। এদের সন্তানদের মধ্যে বরকত দান করো। এদেরকে অস্থিরতা মুক্ত করো। এদের বংশধরদের পূণ্যবান করো। এদের উপর বরকত বর্ষণ করো। এদের বংশধরদের থেকে অধিক সংখ্যক পবিত্র সন্তান সৃষ্টি করো”।

শুভ পরিণয়ের পরপর হযরত ফাতিমা (রা.) স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময়ে এক আলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হয়। যখায়েরন উক্বা এবং নাজাহাতুল মাজালেস কিতাবে উক্ত দৃশ্যের বর্ণনায় এসেছে হযরত ফাতিমা (রা.)-কে সতেজ খচ্ছরের উপর আরোহণ করিয়ে দেয়ার পর হযরত সালমান ফারসী (রা.) কে বাহনের লাগাম ধরে আগে আগে পথ চলার নির্দেশ দেন হুজুর (দ.)। চলার পথে মাঝখানে হঠাৎ জয়ধ্বনির আওয়াজ ভেসে আসে। দেখা যায় হযরত জিবরাইল (আ.) সত্তর হাজার ফিরিশ্তা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। বিশ্বনবী (দ.) তাঁদের আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ফিরিশ্তারা সম্মুখে জানান “আমরা হযরত খাতুনে জান্নাত (রা.)-কে বেলায়তের সশাট হযরত আলী (ক.)'র কর কমলে সমর্পণ করার জন্যে হাজির হয়েছি”। এ সময় হযরত জিবরাইল (আ.) সহ সমবেত ফিরিশ্তারা নারায়ে তাকবীর ধ্বনিতে এলাকাটি মুখরিত করে তোলে। এ দিন ফিরিশ্তারা জমিনের বুকে হযরত আলী (ক.)'র হুজরা শরিফের বাইরে সারারাত আল্লাহর প্রশংসা এবং তাসবীহ পাঠরত ছিলেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র দোয়া এবং নজরে করমের বরকত, হযরত জিবরাইল (আ.)'র নেতৃত্বে ফিরিশ্তাকূলের তসবীহ পাঠ সময়ে মিলন মহিমায় হযরত ফাতিমা (রা.) এবং মওলা আলী (ক.)'র ঔরসে পৃথিবীর বুকে আওলাদে রাসুল (দ.)'র আগমনের শুভ সূচনা পর্ব সম্পন্ন হয়।

মহান আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধি মোতাবেক বিবাহের এক বৎসর পর ৬২৪ খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় হিজরীর ১৫ রমযান হযরত ফাতিমা-আলী (ক.)'র গৃহে আল্লাহর রাসুল (দ.)'র আওলাদ হিসেবে ভূমিষ্ঠ হন হযরত ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা.)। হযরত জিবরাইল (আ.) বেহেশতের একটি উৎকৃষ্ট বস্ত্রখণ্ডে তাঁর নাম লিখে বিশ্বনবী (দ.) সমীপে উপহার স্বরূপ নিয়ে আসেন। ‘হাসান’ নামাঙ্কিত উপহার গ্রহণ করে রাসুলুল্লাহ (দ.) শিশুকে ‘হাসান’ নাম রেখে বরণ করে নেন। পুত্রের নামকরণে বেহেশতী সুসংবাদে বিমোহিত হযরত আলী (ক.) রাসুলুল্লাহ (দ.)'র সিদ্ধান্ত পরম শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য

সহকারে মেনে নেন। হযরত হাসান (রা.) ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সর্বপ্রথম বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র জিহ্বা থেকে লালা মিলিয়ে 'তাহনীক' মিষ্টি মুখ করান।

ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে হযরত হাসান (রা.) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র গভীর সান্নিধ্যে পরম স্নেহ-মমতায় বেড়ে ওঠেন। হুজুর (দ.) হযরত হাসান (রা.)'র জিহ্বা চুষতেন, ঠোঁটে চুমু খেতেন এবং আলিঙ্গনাবদ্ধ হতেন। প্রাথমিক শিক্ষাও তিনি রাসুলুল্লাহ (দ.)'র নৈকটে থেকে অর্জন করেন। জন্মগতভাবে হযরত হাসান (রা.) ছিলেন শান্ত, নম্র, বিনয়ী এবং সুভাষী। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র পৃথিবীর বুকে অবস্থানকালের একদিনের ঘটনা। প্রিয় দৌহিত্রদ্বয়কে নিয়ে রাসুলে খোদা (দ.) উন্মুক্ত প্রান্তরে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে একটি খেজুর বৃক্ষের নীচে বসে পড়েন। দু'পাশে উপবিষ্ট হাসান-হোসাইন। নানা ধরনের আলাপ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে দুই শিশুকে উপদেশমূলক কথাবার্তা বলে চলছিলেন বিশ্বনবী (দ.)। অতঃপর হযরত হাসান (রা.)-কে লক্ষ্য করে শান্তস্বরে বললেন, “আমার বেসালের পর যদি কোন ব্যক্তি আপনার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, যদি আপনার কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করে অথবা ভয়ানক দুঃখ কষ্টের ভিতর নিপতিত করে, অकारণে আপনার উপর অত্যাচার শুরু করে, তাহলে তখন আপনি তাদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন? সামান্যতম বিচলিত না হয়ে হযরত হাসান (রা.) শান্ত কর্তে বিনয়ের সঙ্গে বলেন, “হে রাসুলে খোদা (দ.), আমার প্রিয়তম নানাজী, আমি শত্রুকে সদ্যবহার দ্বারা জয় করতে সচেষ্ট থাকবো। প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধমূলক আচরণ হতে নিজেকে হেফাজত করবার জন্যে সর্বাধিক চেষ্টা করব। অসদাচরণকারীকে স্বীয় সদাচারে প্রণোদিত করে শোধরানোর লক্ষ্যে প্রত্যয়ী থাকবো। প্রতিশোধ প্রতিহিংসা নয়, ভালবাসা এবং সং উপদেশ প্রদান করে বিপথগামীদের সং ও ন্যায়ের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্রিয় থাকবো ইনশাআল্লাহ্। শৈশব থেকে অচঞ্চল ধীর-স্থির, সহিষ্ণু স্বভাবের দৌহিত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহর হাবীব (দ.) ঘোষণা করলেন, “হে আমার পরম আদরের মানিক! আপনার মহৎপ্রাণ এবং ক্ষমাসুন্দর হৃদয়ের প্রকাশ দেখে মহান আল্লাহ্ তা'য়ালার পরম সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি মর্যাদাপ্রাপ্ত হবেন। তিনি মহামূল্যবান পুরস্কারে আপনাকে ভূষিত করবেন”। অতঃপর বললেন, “আপনার বংশধারায় বিশ্ববরেণ্য শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেবে। সমকালীন পৃথিবীর বিপথগামী বিভেদপ্রিয় মানুষ এবং মুসলমানদেরকে তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রকৃত পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাবেন। তাঁদের কঠোর সাধনা এবং চেষ্টায় অনেক কুসংস্কার, অনৈতিকতা, হীনমন্যতা বিলোপ হবে। তাঁদের সত্য, ন্যায়, উদারতা এবং মহত্ব হবে অতুলনীয়।

তাঁরা হবেন ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী ত্রাণকর্তা।” উল্লেখ্য যে, হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র পবিত্র বংশ লতিকা থেকে বিশ্ববরেণ্য গাউসুল আযম-এর আবির্ভাব ঘটেছে। এটি নিঃসন্দেহে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীপটের বিষয়।

আকার-আকৃতির দিক থেকে হযরত ইমাম হাসান (রা.) ছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র সঙ্গে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। হযরত আলী (ক.)'র বর্ণনায় হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র বক্ষ থেকে পবিত্র মস্তক পর্যন্ত হলেন রাসুলে খোদা (দ.)'র অনুরূপ। খলিফাতুর রাসুলিলাহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একবার স্বীয় কাঁধে হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে উপবেশন করিয়ে কসম খেয়ে বলেন, “তাঁর আকৃতি রাসুল (দ.)'র মতো, হযরত আলী (ক.)'র অনুরূপ নয়।” ইমাম আহমদ আবু দাউদ তায়ালিসী ইবনে আবী মুলায়কা (রা.)'র বরাতে উল্লেখ করেন, “হযরত ফাতিমা (রা.) হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র চুলে আঙ্গুল বুলিয়ে বলতেন, ওহ বাবা, এ যে নবী করিম (দ.)'র মতো, আলীর মতো নয়”। হুজুর (দ.)'র বেসালের পর হাসানাইন ভ্রাতৃদ্বয় প্রায়শ রওজায়ে আকদসে গমন করে প্রিয়তম নানাজী (দ.)'র জিয়ারতে থাকতেন। হযরত ইমাম হাসান (রা.) শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বিশ্বনবী (দ.)'র পরম সাহচর্যে নবী গৃহের অভ্যন্তরে শৈশব থেকে পরমাত্মীয় হিসেবে সবকিছু সচক্ষে অবলোকন করে। গৃহবাসীদের সঙ্গে হুজুর (দ.)'র আচার ব্যবহার, কথা-বার্তা এতো কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার সৌভাগ্য হাসান-হোসাইন ব্যতীত আর কারো হয়নি। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানের উদগম ঘটেছে বিশ্বনবী (দ.)'র প্রায় সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে। অতঃপর প্রিয়তমা আন্মাজান খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রা.) থেকে। জ্ঞানের দরজা মহান পিতা হযরত মওলা আলী (ক.) তাঁর প্রকৃত শিক্ষক।

তাঁরা মসজিদে নববীতে সর্বদাই দেখেছেন মহৎপ্রাণ সাহাবায়ে কেলাম এবং নির্বিলাস-নিগুচি জীবনাচারী ধ্যানমগ্ন আসহাবে সুফফাদের। এলম তালিম দেবার জন্যে একজন পিতা হযরত আলী (ক.) ছিলেন অনন্ত-অসীম দরিয়া।

শৈশবে ইমাম ভ্রাতৃদ্বয় প্রায়শ ছুটে যেতেন মসজিদে নববীতে। সাহাবাদের সামনেই চড়ে বসতেন সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, সকল মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র কোলে। এমনকি সিজদারত নবীজির পবিত্র কাঁধে দুই সহোদর বসে পড়তেন। পরম প্রিয় দৌহিত্রদ্বয় সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে নিলে ছিটকে পড়ে ব্যাথা পেতে পারে এ শংকায় নবীজী (দ.) সিজদা বিলম্ব করতেন। চুমু খেতেন দৌহিত্রদ্বয়ের মুখে এবং গণ্ডদেশে। নবীজী (দ.)'র আপত্য স্নেহে বেড়ে উঠেছেন ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁরা হলেন আহলে বাইত এবং পাক পঞ্জতনের পবিত্র সদস্য। পাক পঞ্জতন এবং আহলে বাইতে রাসুল (দ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, “ওহে নবী বংশধর, আল্লাহ্

তা'য়ালার ইচ্ছা হলো যে, আপনাদের থেকে প্রত্যেক ধরনের অপবিত্রতা দূরীভূত করবেন এবং আপনাদেরকে সর্বদিক দিয়ে পুতঃপবিত্র রাখবেন”-(সূরা আহযাব: ৩৩)। আহলে বাইতের ঘটনা সম্পর্কে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) উল্লেখ করেন, “হুজুর (দ.) একটা কালো নকশা বিশিষ্ট চাদর পরিধান করে হুজুরা শরিফে বসে আছেন। এমতাবস্থায় হযরত ফাতিমা (রা.) তশরীফ আনেন। বিশ্বনবী (দ.) তাঁকে চাদরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করান। এরপর হযরত আলী (ক.) আসলে তাঁকেও চাদরে অন্তর্ভুক্ত করেন। হযরত ইমাম হাসান (রা.) আগমন করলে হুজুর (দ.) তাঁকে চাদরের ভিতরে প্রবেশ করান। সর্বশেষ হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) আসলে তাঁকে চাদরে অন্তর্ভুক্ত করে ঘোষণা দেন “হে আল্লাহ্, এই চাদরের অভ্যন্তরে যাঁরা আছেন, এরাই আমার আহলে বাইত এবং আমার বিশেষ পরিজন। আপনি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভূত করুন এবং তাঁদেরকে পুতঃপবিত্র রাখুন”। উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) আহলে বাইত সম্পর্কে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হুজুর (দ.) প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছেন, “আমি এবং আমার আহলে বাইত পাপ থেকে মুক্ত”।

পবিত্র কুরআনে আহলে বাইত সম্পর্কে আরো উল্লেখ আছে, “ওহে আমার হাবীব, আপনি বলে দিন, হে মানব জাতি (বিশেষতঃ বিশ্বাসীরা) আমি তোমাদের নিকট থেকে আমার অতি নিকটতম বিশেষ পরিজন এবং আত্মীয়দের প্রতি ভক্তি ও মুহব্বত ব্যতীত আর কিছু চাইনা”- (সূরা শূ'রা: ৪২)। উপর্যুক্ত আয়াতে করীমা নাযিল হবার পর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) আরজ করেন, “ইয়া রাসুল্লাহ্ (দ.) আপনার বিশেষ পরিজন, নিকটতম আত্মীয় কারা, যাঁদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে ওয়াজিব করা হয়েছে। উত্তরে রাসুল্লাহ্ (দ.) বলেন, “তাঁরা হলেন হযরত আলী, হযরত ফাতিমা এবং তাঁদের দুই সন্তান হযরত হাসান ও হযরত হোসাইন”। আহলে বাইতে রাসুল (দ.)'র বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ‘খাসায়সুল কোবরা’ গ্রন্থে উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা.)'র বরাতে উল্লেখ করা হয়, হুজুর (দ.) ইরশাদ করেন, “এ মসজিদে কোন পুরুষ অথবা কোন মহিলা নাপাকী অবস্থায় প্রবেশ করা হালাল নয়। কিন্তু এটি আমি আলী, ফাতিমা, এবং তাঁদের দু'সন্তান হাসান ও হোসাইনের জন্য বর্ণিত অবস্থায়ও জায়েয।” প্রখ্যাত সাহাবা হযরত আবু যর গিফারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, “আমি কা'বা শরিফের দরজা ধরে বলছি, হুজুর (দ.)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, “জেনে রাখ! তোমাদের মধ্যে আমার আহলে বাইত নূহ (আ.)'র কিশ্তীর ন্যায়। যাঁরা কিশ্তীর উপর আরোহণ করেছে তারা মুক্তি পেয়েছে। আর যাঁরা পেছনে রয়েছে তারা ডুবে মরেছে।” ‘যখায়েরুল উকুবা’ কিতাবে

উল্লেখ আছে, “হুজুর (দ.) ইরশাদ করেছেন, আমরা আহলে বাইত! আমাদের উপর কাউকে তুলনা করা যাবে না।” হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, “হুজুর (দ.) ইরশাদ করেছেন, “আসমানের তারকা জমিনবাসীর জন্য গরকী তথা ঘূর্ণিঝড় থেকে রক্ষাকারী। আর আমার আহলে বাইত আমার উম্মতকে মতবিরোধ থেকে রক্ষাকারী। কোন সম্প্রদায় যদি আহলে বাইত-এর বিরোধিতা করে তারা এখতেলাফের মধ্যে পতিত হবে। পরিশেষে তারা ইবলিশের দলে পরিণত হবে”। হযরত য়ায়েদ বিন আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, হুজুর (দ.) ইরশাদ করেছেন, “নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, তা যদি তোমরা আঁকড়িয়ে ধর তাহলে পরবর্তীতে তোমরা পথহারা হবে না। ঐ দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি অপরটি থেকে বড়। প্রথমটি হলো কিতাবুল্লাহ্, এটি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত নূরের একটি রশ্মির ন্যায়। আর অন্যটি হলো, আমার আহলে বাইত। কুরআন এবং আমার আহলে বাইত দুনিয়ার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য থাকবে একে অপর হতে ভিন্ন হবে না। পরবর্তীতে এ দুইটিই আমার কাছে হাউজে কাউসারের নিকট একত্রিত হবে। আমার পরে এ দুটি জিনিসের ব্যাপারে তোমরা কিরূপ ব্যবহার করবে তা আমি গভীরভাবে দেখব”। ‘খাসায়সুল কোবরা’ কিতাবে হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)'র বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, “হুজুর (দ.) ইরশাদ করেন, যাঁরা আমার আহলে বাইতের সাথে হিংসা বিদ্বেষের মনোভাব রাখবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে হাউজে কাউসার হতে আওনের দোররা দিয়ে প্রহার করে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে”। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র বংশধারা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.)'র মাধ্যমে প্রবাহিত এবং বিকশিত হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, হুজুর (দ.)'র পুত্র সন্তান হযরত আবদুল্লাহ্ (রা.) যখন ওফাত প্রাপ্ত হন, তখন কাফির, মুশরিক, মুনাফিকরা প্রচার করতে থাকে যে, পুত্র সন্তান না থাকায় নবীর বংশ বিস্তার হবে না। এ ধরনের অপপ্রচারের জবাব হিসেবে আল্লাহ্ জান্নাশানুহ্ সূরা কাউসার অবতীর্ণ করেন। এই সূরা মূলতঃ একটি সুসংবাদ যা পুত্র সন্তানের চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ এবং মানব জাতির জন্যে সর্বাধিক গুরুত্ববহ। ‘কাউসারুল খায়রত’ গ্রন্থে সূরা কাউসারের তাফসীর করতে গিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত হুজুর (দ.)'র আওলাদ জারী থাকবে। আল্লাহ্ স্বয়ং হুজুর (দ.)-কে অনেক আওলাদ দান করেছেন। উক্ত কিতাবে হযরত জাবের (রা.)'র বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) ইরশাদ করেছেন, “প্রত্যেক সন্তানের বংশীয় নিসবত পিতার দিক থেকে হয়, কিন্তু আমার কন্যা ফাতিমা (রা.)'র দুই সন্তানের বংশীয় নিসবত আমার মাধ্যমে হয়েছে। আমিই তাঁদের অভিভাবক এবং তত্ত্বাবধায়ক”।

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল করিম (দ.) বলেছেন, “আমার বংশবৃত্তান্ত ও আত্মীয় ছাড়া অন্যান্য সকল প্রকারের আত্মীয়তার বন্ধন ও বংশধারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফাতিমা (রা.)’র সকল সন্তানগণ ব্যতীত সকল মায়ের সন্তানেরই বংশানুক্রম তার পিতার সাথে যুক্ত। আমি তাঁদের পিতা এবং তাঁরাই আমার বংশধারা”। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, বিশ্বনবী (দ.)’র অপর কন্যারা কোন সন্তান রেখে যাননি। হযরত ফাতিমা (রা.)’র কন্যা হযরত কুলসুম (রা.)’র কোন সন্তান জন্ম হয়নি। সুতরাং বিশ্বনবী (দ.)’র বংশধারার পবিত্র নিয়ামত এবং অতুলনীয় অবস্থান উপর্যুক্ত তথ্যের মাধ্যমে আল্লাহ্ স্বয়ং বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র এই অনুপম নিয়ামতের একজন হলেন হযরত ইমাম হাসান (রা.)।

আহলে বাইতে রাসুল (দ.) হিসেবে হযরত ইমাম হাসান (রা.) ছিলেন খোদা প্রদত্ত পবিত্রতা প্রাপ্ত। শোকর-সবর এবং দান খয়রাতের মতো অনুপম চারিত্রিক গুণাবলি ছিল তাঁর মজ্জাগত। রুট-ঝামেলা, ঝগড়া বিবাদ মুক্ত কর্মমুখর জীবন যাপনে তিনি উদ্গ্রীব ছিলেন। সহজ সরল স্বাভাবিক জীবনাচারের আকাঙ্ক্ষী হযরত ইমাম হাসান (রা.) কুট কৌশলকে অনৈতিক কাজ হিসেবে বিবেচনা করতেন। কোথাও রক্তপাত দেখলে বিমর্ষ হয়ে পড়তেন। প্রায় আট বৎসর বয়সকাল পর্যন্ত নানাজী বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র সরাসরি সুগভীর সান্নিধ্য প্রাপ্ত অতুলনীয় মেধা ও স্মরণ শক্তির অধিকারী ছিলেন হযরত ইমাম হাসান (রা.)। হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.) উল্লেখ করেছেন, রাসুলুল্লাহ (দ.)’র নিকট ওহী আসার পর তা আবৃত্তি শুনে হযরত ইমাম হাসান (রা.) সঙ্গে সঙ্গে স্মরণে রাখতেন। মায়ের পবিত্র আঁচলে পৌছা মাত্র তা তিনি হযরত ফাতিমা (রা.)-কে শুনাতেন। পরে আয়াতসমূহ হযরত ফাতিমা (রা.) যখন হযরত আলী (ক.)’র সমীপে পেশ করতেন তখন কোথা থেকে জেনেছেন হযরত আলী (ক.) জিজ্ঞেস করলে বলতেন, “হাসান নবীজী (দ.) থেকে শুনে তা আমাকে শুনিয়েছেন”। অসাধারণ মেধা এবং প্রতিভার অধিকারী হযরত ইমাম হাসান (রা.) ওহী নাজিল হবার পর সাহাবীদের নিকট ব্যক্ত করা কালে নানাজী বিশ্বনবী (দ.)’র পবিত্র কণ্ঠ নিসৃত আল্লাহ্‌র বাণী অবিকল স্মরণে রেখে মা ফাতিমা (রা.)-কে প্রায়ই শোনাতেন। বিশ্বনবী (দ.) তাঁর দৌহিত্রদ্বয়কে এতো ভালবাসতেন যে, কোন কোন সময় এমন হতো, রাসুলুল্লাহ (দ.) নামায আদায়কালে সিজদারত অবস্থায় হাসান-হোসাইন দু’জন তাঁর পিঠ মোবারকে চড়ে বসতেন। এতে সিজদা বিলম্ব হতো। ইবনে খুযায়মা আবদাহ্ ইবনে আবদিল্লাহ্ আবদুল্লাহ্ ইবনে বুরায়দার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, “একদিন রাসুলুল্লাহ (দ.) খুত্বা প্রদান কালে হযরত ইমাম

হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মসজিদে প্রবেশ করেন। তাঁদের পরিধানে ছিল লাল জামা। জামা বড় হওয়াতে তাঁরা জামা পেঁচিয়ে হাঁচট খাচ্ছিলেন আর উঠছিলেন। এক পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ (দ.) মিম্বর থেকে নেমে তাঁদের নিকট গেলেন এবং তাঁদের তুলে এনে মিম্বরে তাঁর কোলে বসালেন এবং বললেন, “আমি এই বাচ্চা দু’টিকে দেখে স্থির থাকতে পারিনি।” তিরমিযী শরিফে আবু যুবায়ের সূত্রে বর্ণনা এসেছে, “একদা হুজুর (দ.) সমীপে উপস্থিত হয়ে দেখা গেল, তাঁর পিঠে হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)। তিনি তাঁদেরকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমি তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, “বাহ্! কতো উত্তম আপনাদের দু’জনের বাহন”। রাসুলে খোদা (দ.) বলেন, “এবং কতো উত্তম এই দুই আরোহী”। হযরত আলী (ক.) আবু সাঈদ (রা.) এবং হযরত বুরাইদা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, “রাসুলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, “হাসান এবং হোসাইন (রা.) জান্নাতী যুবকদের নেতা। তবে তাদের পিতা তাদের চাইতে উত্তম”। হযরত হাসান এবং হোসাইন (রা.) সম্পর্কে এ ধরনের অনেক হাদীস বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র বেসালের পর হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত হোসাইন (রা.) প্রায়শঃ নানাজী (দ.)’র জিয়ারতে রওজায়ে আকদসে হাজির থাকতেন। রাসুল নন্দিনী মা ফাতিমা যাহরা (রা.)’র ওফাতের পূর্বে পরম স্নেহে পুত্রদ্বয়কে জড়িয়ে ধরে বলেন, “বাছা তোমরা তোমাদের নানাজানের রওজা শরিফে গিয়ে জিয়ারত করো এবং আমার জন্যে মাগফিরাত কামনা করো।” ভ্রাতৃদ্বয় মায়ের কথা অনুযায়ী দ্রুত রওজা শরিফে প্রবেশ করা মাত্র শুনতে পান, “হে হাসান-হোসাইন তোমরা দ্রুত বাড়ি চলে যাও। তোমাদের মা আর বেশিক্ষণ দুনিয়াতে থাকবে না। তোমরা পাশে থাকো”। প্রিয় পুত্রদ্বয়কে জানানো গায়েবী আওয়াজের বিষয়টি তাঁরা মা’কে জ্ঞাত করেন। হযরত আলী (ক.) গৃহে আসলে হযরত ফাতিমা (রা.) পুত্রদ্বয়ের বর্ণিত ঘটনা মওলা আলী (ক.)-কে অবহিত করেন এবং হাসান-হোসাইনকে নিয়ে পুনরায় নবীজী (দ.)’র রওজা পাকে প্রেরণ করেন। তাঁরা পবিত্র রওজায়ে আকদসে অবস্থানকালে হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.) বেসালপ্রাপ্ত হন। মাতৃ বিয়োগের পর পিতার পরম ঘনিষ্ঠ সাহচর্য এবং শিক্ষা প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মহানবী (দ.)’র দৌহিত্রদ্বয় বেড়ে ওঠেন। মহান পিতার পরিচর্যায় তাঁদের চরিত্রে যেমন ত্যাগ, সহনশীলতা, নির্বিলাস নির্মোহ-নির্লোভের প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি অন্যায়ের প্রতিবাদে পার্থিব জীবনের সকল প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মের মৌলিকত্ব রক্ষার তাগিদে একই সঙ্গে পবিত্র হস্তে উত্তোলিত হয়েছে আলীর ‘জুলফিকার’।

আশৈশব অত্যন্ত শান্ত, কোমল স্বভাবজাত ভাবুক হযরত ইমাম হাসান (রা.) ছিলেন ধার্মিকতার প্রতীক, তাসাওউফ সাধনায় নিমজ্জিত প্রাণ। জ্ঞানার্জন, দানশীলতা, ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করতেন বেশিরভাগ সময়। হযরত আলী (ক.)'র খিলাফতকালে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ সময়ে তিনি পিতার সঙ্গে থেকে প্রায়শঃ সহনশীল মনোভাব নিয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্বীৰ্ব থাকতেন। পবিত্র মদিনা নগরীতে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) বিদ্রোহী কর্তৃক অবরুদ্ধ হলে খলিফার গৃহদ্বার বিদ্রোহীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে হযরত আলী (ক.)'র নির্দেশে সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন হযরত ইমাম হাসান এবং হোসাইন (রা.)। হযরত উসমান (রা.)'র গৃহদ্বারে আহলে বাইতে রাসুল (দ.) এই দুই মহান সদস্যের উপস্থিত থাকার কারণে বিদ্রোহীরা সম্মুখ দরজা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশের সাহস করেনি। এ সময় হযরত হাসান (রা.)ও আহত হয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র উট যখন আহত অবস্থায় ভূপাতিত হয় তখন উম্মুল মুমিনীনকে ত্বরিত উদ্ধার করে যথাযথ মর্যাদা সহকারে সেবা যত্ন এবং হেফাজতে রাখার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন হযরত ইমাম হাসান (রা.)। পিতৃ নির্দেশে সুদক্ষ প্রহরী সহযোগে উম্মুল মুমিনীনকে মদিনায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন হযরত ইমাম হাসান (রা.)। তিনি এ সময় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র অনুগামী হিসেবে কিছু পথ এগিয়ে দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন।

পবিত্র কুরআন এবং হাদীস শরিফের বর্ণনানুযায়ী ইমাম হাসান (রা.) ছিলেন নিষ্পাপ। এরপরেও মহান আল্লাহর ভয় এবং সান্নিধ্য লাভের আশায় প্রায়শঃ সারারাত ক্রন্দন করতেন। বছরের অধিকাংশ সময় রোজা রাখতেন। কমপক্ষে পঁচিশবার মদিনা শরিফ থেকে পায়ে হেঁটে মক্কায় গিয়ে পবিত্র হজ্জ সম্পন্ন করেন। আবার বিশ বার পায়ে হেঁটে মক্কা থেকে মদিনা ফিরেছেন। হযরত হাসান (রা.) ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাহসী এবং স্পষ্টবাদী। হযরত ইমাম হাসান (রা.) মুসলমানদের সঙ্গে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর পিতার সঙ্গে প্রত্যেকটি যুদ্ধে তাঁর ভাই ইমাম হোসাইন (রা.) সহ তিনি অংশ নিয়েছিলেন এবং জীবনে কোন যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসেননি। শৈশব থেকে তিনি এতোবেশি উদার এবং মহানুভব ছিলেন যে ভিক্ষুকদের পাশে বসতেও কখনো কুষ্ঠাবোধ করতেন না। গরীব দুঃখীদের সঙ্গে কথা বলে তাদের সমস্যা-সংকটাদি জ্ঞাত হবার জন্যে তিনি মদিনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন।

হযরত ইমাম হাসান এবং হোসাইন (রা.)'র মূল শিক্ষক ছিলেন হযরত আলী (ক.) স্বয়ং। বিভিন্ন শিক্ষা এবং জ্ঞানদানের পাশাপাশি তিনি স্বীয় সন্তানদের সঙ্গে কথোপকথন এবং প্রশ্নোত্তরে জড়িয়ে পড়তেন। এর মাধ্যমে তিনি

সন্তানদের জ্ঞান ও শিক্ষা পরিমাপ করে দেখতেন। প্রয়োজনে তালিম দিতেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র দৌহিত্র আহলে বাইতে হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র দর্শন এবং আত্মজগৎ সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির সুবিধার্থে মাওলা আলী (ক.)'র সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এবং ভাববোধক বাক্য বিনিময়ের বিষয়টি উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ইলমের দরজার সনদপ্রাপ্ত হযরত আলী (ক.) স্বীয় পুত্র হযরত হাসান (রা.)-কে মানবতাবোধ এবং সৌজন্যমূলক আচরণ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র চারিত্রিক সৌন্দর্য, মনোভাব এবং আচার-আচরণ বিষয়ে উপলব্ধির জন্যে পিতা-পুত্রের কথোপকথনটি পাঠক সমীপে পেশ করা প্রয়োজন। হযরত আলী (ক.) প্রিয় পুত্রকে প্রশ্ন করেছিলেন, ১. বৎস, সরলতা কী? হাসান বলেন, আব্বা, সরলতা হলো ভাল আচরণ দ্বারা মন্দ আচরণের জবাব দেয়া। ২. ভদ্রতা কী? ভদ্রতা হলো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং ওদের দায়-দেনার বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেয়া। ৩. নীচতা কী? নীচতা হলো স্বল্প পরিসরে দৃষ্টি সীমিত রাখা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু অন্যকে প্রদানে বিরত থাকা। ৪. সমালোচনা-যোগ্য কাজ কী? হযরত ইমাম হাসান (রা.) বলেন, স্ত্রীর জন্যে দেদারছে ব্যয় করা আর নিজেকে বঞ্চিত রাখা। ৫. দানশীলতা কী? স্বচ্ছলতা-অভাব সর্বাবস্থায় দান করা। ৬. কার্পণ্য কী? হযরত ইমাম হাসান (রা.) বলেন, হাতে নগদ যা আছে তাকে অল্প মনে করা আর যা ব্যয় করা হয়েছে সেটাকে নষ্ট হয়েছে মনে করা। ৭. ভ্রাতৃত্ব কী? সুখে ও দুঃখে অঙ্গীকার পালন করা। ৮. কাপুরুষতা কী? বন্ধুর বিরুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন আর শত্রুর নিকট মাথা নত করা। ৯. অতঃপর হযরত আলী স্বীয় পুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, সাফল্য কিসে? হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র সুস্পষ্ট অভিমত, তাকওয়া এবং আল্লাহভীতির প্রতি আকর্ষণ এবং দুনিয়ার প্রতি প্রীতি-মহব্বত পরিত্যাগ। পিতা-পুত্রের সুদীর্ঘ কথোপকথনে প্রকাশ ঘটেছে মানব চরিত্র অর্জনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড নির্ধারক অসংখ্য মনোজাগতিক সূত্রের। হযরত আলী জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে প্রশ্ন করেন, ১০. ধৈর্য কী? হযরত ইমাম হাসান (রা.) উত্তরে বলেন, ক্রোধ সংবরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। ১১. অভাব মুক্তি কী? সংখ্যা বা পরিমাণে কম দেখা গেলেও আল্লাহ্ যা বণ্টন করে দিয়েছেন, তাতে পরিতৃপ্ত থাকা। কারণ অভাব মুক্তি হলো মূলতঃ মনের অভাব মুক্তি। ১২. দারিদ্র্য ও অভাব কী? সকল ক্ষেত্রে লোভী হওয়া। ১৩. প্রতিরক্ষা কী? হযরত ইমাম হাসান (রা.) বলেন, প্রচণ্ড যুদ্ধ ও কঠোরতম শত্রুকে পরাজিত করা। ১৪. হীনতা কী? প্রয়োজনের সময় ঘাবড়ে যাওয়া। ১৫. সাহসিকতা কী? সমবয়সী ও সতীর্থদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকা। ১৬. ভড়ৎ

কী? অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক বিষয়ে কথা বলা। ১৭. অভিজাত্য কী? জরিমানা আদায় করা এবং অন্যের দোষ ক্ষমা করা। ১৮. গভীর জ্ঞান কী? অর্জিত সকল বিষয় স্মরণ রাখা। ১৯. ফাটল কী? নিজের নেতার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করা এবং তার বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলা। ২০. প্রশংসাযোগ্য কাজ কী? সুন্দরের বাস্তবায়নে অসুন্দরকে বর্জন করা। ২১. বুদ্ধিমত্তা কী? হযরত হাসান বলেন, উচ্চপদস্থদের সঙ্গে বিনীত আচরণ করা এবং নেতিবাচক সংশয়ের প্রেক্ষাপটে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থেকে নিজেকে রক্ষা করা হলো বুদ্ধিমত্তা। ২২. অভিজাত্য সম্পর্কে পুনরালাপের এক পর্যায়ে হযরত ইমাম হাসান (রা.) বলেন, ভ্রাতৃবর্গকে সহযোগিতা করা এবং প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা। ২৩. মূর্খতা কী? হীন ও তুচ্ছ বিষয়ে অনুগামী হওয়া এবং বিপথগামী লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা। ২৪. উদাসীনতা কী? মসজিদের পথ পরিহার করে ভ্রান্ত পথে চলা। ২৫. বঞ্চনা কী? লাভজনক বস্তু সামনে আসার পরও সেটি প্রত্যাখ্যান করা। ২৬. নেতৃত্ব কী? হযরত হাসান (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি মালের ব্যাপারে উদাসীন ও সমাজের সেবায় সদা নিয়োজিত, বেকুফ ও মূর্খ লোকেরা গালি দিলেও যে রাগ করে না, উত্তর দেয় না - সেই নেতা।

স্বীয় পুত্রের সঙ্গে কথোপকথনের শেষ পর্যায়ে হযরত আলী (ক.) রাসূলুল্লাহ (দ.)-এর হাদীস উল্লেখ করে বলেন, “অজ্ঞতার চাইতে কঠিন দারিদ্র্য নেই। বিদ্যার চাইতে উত্তম সম্পদ নেই। আত্মশ্লাঘার চেয়ে ভয়ানক নির্জনতা নেই। পরামর্শের চাইতে কার্যকর সাহায্য নেই। পরিকল্পনার ন্যায় কোন বুদ্ধিমত্তা নেই। সৎ চরিত্রের ন্যায় কোন অভিজাত্য নেই। আত্মরক্ষার ন্যায় পরহেয়গারী নেই। ধ্যানের ন্যায় কোন ইবাদত নেই। লজ্জার ন্যায় কোন ঈমান নেই। ঈমানের মূল হলো সবর ও ধৈর্য। কথার বিপদ হলো মিথ্যা বলা। বিদ্যার বিপদ হলো ভুলে যাওয়া। সহনশীলতার বিপদ হলো অজ্ঞতা। ইবাদতের বিপদ হলো বিরতি দেয়া। দানশীলতার বিপদ হলো গর্ব করা। বীরত্বের বিপদ হলো বিদ্রোহ করা। ভালোবাসার বিপদ হলো দম্ব করা। হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে অতঃপর হযরত আলী (ক.) বিশ্বনবী (দ.)’র উপর্যুক্ত বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, “বৎস, যাকে তুমি সব সময় দেখে থাকো, তাকে অবহেলা করো না। সে যদি তোমার চেয়ে বয়স্ক হয় তুমি তাঁকে পিতার ন্যায় সম্মান করবে। আর যদি তোমার সমবয়স্ক হয় তবে তাকে ভাইরূপে গ্রহণ করবে। যদি তোমার চাইতে ছোট হয় তাকে তুমি পুত্র হিসেবে গ্রহণ করবে। মূলতঃ উপর্যুক্ত কথোপকথন এবং উপদেশাবলি ছিলো স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা.)-কে বেলায়তের সুউচ্চ পদমর্যাদায় অভিষিক্ত করার লক্ষ্যে চূড়ান্ত দীক্ষা প্রদান। একই সঙ্গে তাসাওউফ চরিত্র হাসিলের জন্যে

এ ধরনের নীতি-নির্দেশক পারস্পরিক আলোচনা হচ্ছে এক ধরনের ওজিফা।

মহান পিতা বেলায়তের সশ্রুটি হযরত আলী (ক.) থেকে স্বীয় যোগ্যতার কারণে উত্তরাধিকার ভিত্তিতে সরাসরি বেলায়ত প্রাপ্ত হযরত হাসান (রা.) হাকীকত ও তুরিকতে ছিলেন অতি উচ্চমর্যাদায় সমাসীন। ফিতনার দরজা খুলে পড়ার পর ইসলামে কদরিয়া, মুতাযিলা প্রভৃতি মতবাদিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটতে থাকে। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের কারণে খারেজী-শিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায় মুসলমানদের চিন্তা, চেতনা এবং কর্মধারায় বিভ্রান্তি এবং মতভিন্নতা ছড়িয়ে দিয়ে বিভেদ ও অনৈক্যের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। চিন্তা এবং বোধ-বোধনের ভিন্নতার কারণে আদর্শিক অনৈক্য তীব্র আকার ধারণ করায় ধর্মানুসারীদের মধ্যে অস্থিরতার প্রকাশ ঘটতে থাকে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বেশকিছু মৌলিক বিষয়ে সৃষ্ট বিতর্ক নিরসন করা তখন ফকীহ, আলেম এমনকি অলি-দরবেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য সমাধান নিরূপণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তুরিকতের অন্যতম ইমাম হযরত হাসান বসরী (রা.) এক পত্রে উল্লেখ করেন, “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হে আল্লাহর রাসূলের সন্তান ও তাঁর চোখের শান্তি, আপনার উপর আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। অতঃপর আরয এই যে, আপনারা বনী হাশিমের বংশধর গভীর সমুদ্রে চলমান নৌকার ন্যায়। আপনারা এমন উজ্জ্বল তারকা, এমন পথ প্রদর্শক এবং ইমাম ও নেতা যে, যারা আপনাদের অনুসরণ করে, তারা হযরত নূহ (আ.)-এর নৌকায় আরোহণকারীদের ন্যায় বিপদ থেকে পরিত্রাণ পায়। সুতরাং আমরা জবরিয়া ও কদরিয়া সম্প্রদায়ের মতবাদ নিয়ে যে বিপদে পতিত হয়েছি এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? আপনি রাসূলুল্লাহ (দ.)’র পবিত্র বংশধর। আপনারা আল্লাহর ইলম হতে জ্ঞান লাভ করেছেন। আল্লাহ আপনাদের রক্ষক ও সাক্ষী। আপনারা সমস্ত সৃষ্টির রক্ষক ও সাক্ষী।”

উপর্যুক্ত পত্রের লিখিত জবাবে হযরত ইমাম হাসান (রা.) সমাধানের পথ নির্দেশ করে উল্লেখ করেন, “বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহিম। অতঃপর আপনার পত্র পৌঁছেছে, যাতে আপনার ও অন্যান্যদের হয়রানী ও পেরেশানীর কথা উল্লেখ করেছেন। বিতর্কিত মাসয়ালা সম্পর্কে আমার অভিমত এই যে, যে ব্যক্তি তাকদীরের ভাল-মন্দ আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা বিশ্বাস করে না, সে কাফির। আর যে স্বীয় পাপকর্মের বোঝা আল্লাহর উপর চাপিয়ে দেয় সে বদকার। মূলত আল্লাহ তা’আলা কাউকে পাপ-পূণ্য করার জন্য বাধ্য করেন না। পক্ষান্তরে তিনি তার রাজ্যে কাউকে বলাহীনভাবে ছেড়েও দেন না। বান্দার মালিকানাধীন সমস্ত কিছু এবং তার আয়ত্বাধীন সবকিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহ

তা'আলা যদি বান্দাকে তাঁর অনুগত হওয়ার জন্য বাধ্য করতেন, তবে তার ইচ্ছাধীন কোন কাজ থাকত না এবং অনুগত হওয়া ব্যতীত কোন উপায়ও থাকত না। আর যদি তাকে পাপ করা হতে বিরত রাখতে ইচ্ছা করতেন, তবে তিনি তার পাপ করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতেন। ফলে এ অবস্থায় বান্দার কিছু করা বা না করা উভয়ই সমান হয়ে যেত। তাই আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পাপ-পুণ্য করা বা না করার জন্য বাধ্য করেন নি। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলম ও মারিফাত দান করে তার চলার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাই আপনি ঐ পথ অবলম্বন করুন, যে পথে চলার জন্য আল্লাহ পাক নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর যা করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, তা করা থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখুন, আল্লাহর সাথে তর্ক-বিতর্ক করে কেউ জয়ী হতে পারবে না। সর্বাবস্থায় তিনিই জয়ী হবেন।” তকদীর সম্পর্কে হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র ফয়সালায় একদিকে ইলমে মারিফাত সম্পর্কিত জ্ঞানের যেমন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তেমনি ফিকাহ সম্পর্কে তাঁর সুগভীর ধারণাও স্পষ্ট হয়েছে। হযরত ইমাম হাসান (রা.) পার্থিব জগতে অবস্থান কালে মতবাদিক বিভিন্নতার কারণে সৃষ্ট বিশ্বাসগত তাত্ত্বিক বিরোধসমূহ সমাধানের সঠিক পস্থা নিরূপনের জন্যে প্রায় সকল আলেম ওলামারা তাঁর দ্বারস্থ হতেন এবং যথাযথ নির্দেশনা চাইতেন।

স্বভাবজাত জামালী জলোয়ার ব্যক্তিত্ব হযরত ইমাম হাসান (রা.)। নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ এবং বিশ্বাসে অনমনীয় হওয়া সত্ত্বেও সবার-শোকরের কারণে শত্রুর মুখ থেকেও তাঁর নিমিত্তে ধ্বনিত হয়েছে ঈর্ষণীয় প্রশংসার উপমা। উমাইয়া বংশের দুষ্ট চক্রের কুটিল কারসাজিতে বিষ প্রয়োগের কারণে শাহাদতবরণ করলে তাঁর দাফন সম্পর্কে মদিনায় নিযুক্ত গভর্নর হাকাম পুত্র মারওয়ানের ভূমিকা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিষ প্রয়োগের কারণে শাহাদতবরণের পূর্বে উপস্থিত সাহাবা কেলাম সমীপে জানাযার পর তাঁকে মসজিদে নববীতে অবস্থিত পবিত্রতম রওজা আকদসে নবীজী (দ.)'র পাশে সমাহিত করার অসিয়ত করেন। এ বিষয়ে রওজা পাকের তত্ত্বাবধায়িকা উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)'র সম্মতিও গ্রহণ করা হয়। একই সঙ্গে তিনি এ কথা বলে যান যে, যদি মারওয়ান বা উমাইয়ারা দাফন বিষয়ে কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করে তাহলে তাঁকে যেন খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা যাহরা (রা.)'র পাশে দাফন করা হয়। এ ব্যাপারে কোন প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি না করতে তিনি স্পষ্টভাবে নিষেধ করেন। দাফন সংক্রান্ত বিষয়ে ঠিকই মারওয়ান নিষেধাজ্ঞা জারী করে উল্লেখ করেন, “যেহেতু হযরত উসমান যুন্নুরাইন (রা.)'র দাফন রওজায়ে আকদসে হয়নি, সেহেতু হযরত হাসান (রা.)'র দাফনও নবীজী (দ.)'র

পাশে করা যাবে না। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নবীজী (দ.)'র শানে ‘জালালী’র মূর্তপ্রতীক হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) মারওয়ানী বাধা অপসারণের লক্ষ্যে অস্ত্র ধারণের আহ্বান জানালে মদিনার সর্বত্র নবী (দ.) প্রেমিকদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রক্তাক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হবার পূর্বে প্রখ্যাত সাহাবা হযরত ইমাম আবু হোরায়রা (রা.) সহ প্রবীণরা হযরত ইমাম হোসাইন (রা.)-কে তাঁর বড় ভাইয়ের অসিয়ত স্মরণ করিয়ে দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে যায়।

হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র জানাযায় মারওয়ানের অবস্থা বর্ণনা দিয়ে হযরত জুওয়াইরিয়া ইবনে আসমা (রা.) উল্লেখ করেন, “হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র শাহাদতের পর তাঁর জানাযায় মারওয়ান কাঁদছিলেন। তখন হযরত ইমাম হোসাইন (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ‘একি আপনি হাসান (রা.)'র ওফাতে কাঁদছেন? অথচ জীবিত থাকাকালে আপনি তাকে চিবিয়ে খেতে চেয়েছেন, অনেক অশালীন উদ্ধত আচরণ করেছেন, উত্তরে মারওয়ান একটি উঁচু পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করে উল্লেখ করেন, “আমি তো এই আচরণ করতাম পাহাড়ের চেয়েও অধিক ধৈর্যশীল এ ব্যক্তিত্বের প্রতি’। ‘শত্রুর পক্ষ থেকে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মহানত্বের’ বিষয়ে উপলব্ধিগত স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এক কথায় হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র চারিত্রিক মহানত্ব শত্রুকেও কাঁদিয়ে ছেড়েছে।

হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র ধৈর্য এবং সহনশীলতা সম্পর্কে এক বর্ণনায় কাশফুল মাহজুব কিতাবে হযরত আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জে বখশ (র.) উল্লেখ করেন, “একবার কুফার বাড়ীতে বাইরে অবস্থানকালে জংলী প্রকৃতির এক আরব এসে তাঁকে এলোপাখাড়ি গালিগালাজ শুরু করে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি ক্ষুধা পেয়েছে না পিপাসা, নাকি তোমার অন্য কোন অসুবিধা আছে? কিন্তু লোকটি কর্ণপাত না করে পুনরায় হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে মা-বাপ তুলে গালি দিতে থাকে। আগন্তকের উগ্র আচরণ লক্ষ্য করে তিনি শান্ত ভাষায় তার ব্যক্তিগত খাদেমকে গৃহে রক্ষিত টাকার থলেটি জংলী স্বভাবের লোকটিকে প্রদানের নির্দেশ দেন। টাকার থলেটি দানের সময় তিনি বলেন, ‘ভাই, ঘরে এ ছাড়া আর কোন টাকা নেই। যদি থাকত তাও দিয়ে দিতাম’। হযরত ইমাম হাসান (রা.)'র অভাবনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে সে জংলী স্বভাবের আরব লোকটি বিম্বিত হয়ে বলে উঠে, ‘আমি সাম্প্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহর রাসুলের বংশধর’।

অন্য আরেক দিনের ঘটনা। মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ফাদল ইবনে দাকীন রাযীন ইবনে সিওয়ান থেকে বর্ণনা করেন, “হযরত ইমাম হাসান (রা.) এবং মারওয়ানের মধ্যে বিরোধ চলছে। মারওয়ান এক সূত্রে হযরত ইমাম হাসান (রা.)-কে অনেক

কটু ও কঠোর কথা বলে যাচ্ছে। হযরত ইমাম হাসান (রা.) তা নীরবে সহ্য করে চলেছেন। কোন প্রকার প্রত্যুত্তর করছেন না। এ পর্যায়ে মারওয়ান ডান হাতে তার নাকের ময়লা পরিষ্কার করতে থাকে। তখন হযরত ইমাম হাসান (রা.) বলেন, ‘আফসোস! আপনি কি জানেন যে ডান হাত মুখমণ্ডলের জন্যে আর বাম হাত লজ্জা স্থানের জন্যে। দুঃখ আপনার জন্যে’ তখন মারওয়ান চূপ হয়ে যায়। উক্ত ঘটনায় ব্যক্তি হযরত ইমাম হাসান (রা.)’র সহনশীলতার পাশাপাশি ইলমে তাহরাত সম্পর্কিত গভীর ও সতর্কজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

আগন্তুক, এমনকি বিবাদ সৃষ্টিকারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা বাক্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে হযরত ইমাম হাসান (রা.)’র কোন জুড়ি নেই। মুহাম্মদ ইবনে সা’দ যথাক্রমে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম আসাদী ইবনে আওন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কারো সাথে আলাপকালে আরো আলাপের জন্যে এমন প্রিয় মানুষ আমার নিকট হযরত ইমাম হাসান (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ নন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে কোনদিন অশ্লীল কথা বলতে শুনিনি, শুনেছি মাত্র একবার। তখন তাঁর এবং আমার ইবনে উসমানের মধ্যে বিবাদ চলছিল। তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমাদের নিকট শুধু তাই রয়েছে যা তাঁর জন্যে ‘শুধু অপমান কর’। অর্থাৎ ‘শুধু অপমান শব্দগুলোই ছিল ইবনে সা’দ এর দৃষ্টিতে অশ্লীল।

আল্লাহ্‌র ফয়সালায় সন্তুষ্টি সম্পর্কে হযরত ইমাম হাসান (রা.)’র দৃঢ় বিশ্বাসের বর্ণনা দিয়ে আবুল আব্বাস মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ আল মাবরাদ বলেছেন, “হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে বলা হয়েছিল যে, আবু যর তো বলে থাকেন, ‘ধন-সম্পদ অপেক্ষা দারিদ্র্য আমার নিকট অধিকতর প্রিয়, সুস্থতা অপেক্ষা রুগ্নতা আমার অধিক প্রিয়’ তখন হযরত ইমাম হাসান (রা.) বলেছিলেন, ‘আল্লাহ্‌ তা’য়ালা আবু যরকে দয়া করুন। আমি বরং বলি আল্লাহ্‌ তা’য়ালা যার জন্যে যা কল্যাণকর হিসেবে মঞ্জুর করেন তার উপর যে নির্ভর করে সে কখনো আল্লাহ্‌র মঞ্জুর করা বিষয়ে বিপরীতটি কামনা করবে না। এ পর্যায়ে হালো আল্লাহ্‌র ফায়সালায় রাজী থাকার পর্যায়ে এবং এটি দ্বারা আল্লাহ্‌র ফায়সালা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়’।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া কিতাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত হাসান (রা.) কালো বর্ণের এক ক্রীতদাস যুবককে দেখলেন, সে একটি রুটি খাচ্ছে। তার পাশে একটি কুকুর বসেছিল। যুবকটি নিজে এক লোকমা রুটি খাচ্ছেন আর কুকুরকেও এক লোকমা খাওয়াচ্ছেন। পালাক্রমে যুবকটি রুটি খাচ্ছিলেন আর কুকুরকেও খাওয়াচ্ছেন। হযরত হাসান (রা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিসে তুমি এ মহৎকাজে উৎসাহিত হয়েছ? যুবকটি

জানায় ‘আমি খাব আর কুকুর উপোস থাকবে এটি আমার নিকট লজ্জার মনে হচ্ছে। তাই এমনটি করছি’। অতঃপর হযরত হাসান (রা.) যুবককে বললেন, ‘আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানে থাক’। ইতোমধ্যে হযরত হাসান (রা.) ক্রীতদাসের মালিকের নিকট গমন করে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। যে বাগানে ক্রীতদাসটি ছিলেন সেটিও হযরত হাসান (রা.) ক্রয় করে তাকে দান করেন। এ ধরনের অবস্থায় ক্রীতদাস বলে ওঠেন, ‘ওহে আমার মালিক, যার সন্তুষ্টির জন্যে আপনি আমাকে এই বাগান দান করেছেন তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে আমি বাগান দান করে দিলাম’। তাসাওউফ জগতে নির্মোহভাবে বিচরণকারী এক যুবকের কুকুরের প্রতি মানবিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের পর তাজেদারে বেলায়ত হযরত হাসান (রা.)’র পুরস্কার প্রদানের মধ্যে রয়েছে তাসাওউফের প্রকৃত গতিধারা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের নেয়ামত।

আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া গ্রন্থে উল্লেখ আছে, একবার হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন (রা.) ইতিকাহে ছিলেন। আবু জাফর বাকির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এভাবে, এক ব্যক্তি কোন এক প্রয়োজনে হযরত হোসাইন (রা.)’র সাহায্য প্রার্থী হন। ইতিকাহে থাকায় হযরত হোসাইন (রা.) উক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন। অতঃপর সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তি হযরত হাসান (রা.)’র নিকট গমন করে তার প্রয়োজন ব্যক্ত করেন। হযরত হাসান (রা.) উক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়ে বলেন, “আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমার একজন ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে দেয়া আমার নিকট এক মাসের ইতিকাহের চেয়েও অধিক প্রিয়”। ইসলাম ধর্মের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপলব্ধির ব্যাপারে হযরত হাসান (রা.) ছিলেন এক অনাবিল আদর্শ।

জ্ঞান সাধনার বিষয়ে হযরত হাসান (রা.) ছিলেন ‘সিরাজুম মুনীরা’। ইমাম আহমদ মুত্তালিব ইবনে যিয়াদ মুহাম্মদ ইবনে আবান থেকে বর্ণনা করেছেন, “হযরত হাসান (রা.) তাঁর পুত্রদেরকে এবং তাঁর ভাতিজাদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তোমরা জ্ঞানার্জন কর। কারণ আজ তোমরা জাতির শিশু সমাজ, পরবর্তীতে তোমরা হবে জাতির কর্ণধার। যারা একথা স্মরণ রাখতে পারবে না তারা লিখে রাখ”। মাওলা আলী (ক.) সম্পর্কে শিয়া সম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রচারের বিষয়ে হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)’র সুস্পষ্ট অভিমত রয়েছে। মুহাম্মদ ইবনে সা’দ যথাক্রমে হাসান ইবনে মুসা এবং আহমদ ইবনে ইউনুস যুহায়র ইবনে মু’আবিয়া আবু ইসহাক আমর ইবনে আসাম্ম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, “আমি হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে জানতে চাইলাম, ‘শিয়া সম্প্রদায় বিশ্বাস করে যে, কিয়ামতের পূর্বে হযরত আলী পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হবেন (এটা কি?), উত্তরে

হযরত হাসান (রা.) বলেন, ‘আল্লাহর কসম তারা মিথ্যে বলেছে। ওরা মূলতঃ হযরত আলী (রা.)’র দল নয়। আমরা যদি জানতাম যে, হযরত আলী (রা.) পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরিত হবেন, তা হলে আমরা তাঁর স্ত্রীদেরকে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার সুযোগ দিতাম না এবং তাঁর ত্যাজ্য-সম্পত্তি ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতাম না।’ উপর্যুক্ত বক্তব্যে শিয়া সম্প্রদায়ের ভাবাদর্শ সম্পর্কে হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)’র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে এবং আহলে বাইতে রাসুল (দ.) সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করা হয়েছে”।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আবু আলী সুওয়াইদ আল-তাহহান সাফীনা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, “রাসুলুল্লাহ (দ.) বলেছেন, আমার পর ত্রিশ বছর খিলাফত ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চলমান থাকবে।” বিশ্বনবী (দ.) ঘোষিত উপর্যুক্ত হাদিস শরিফ শ্রবণ করে এ ব্যক্তি বলেন, ‘ঐ ত্রিশ বছরের মধ্যে ছয়মাস হল আমীর মুয়াবিয়ার শাসনকাল। তখন হযরত সাফীনা (রা.) বলেছেন, ‘ঐ ছয় মাস কেমন করে মুয়াবিয়ার শাসনামলে সংযোজিত হবে? ঐ ছয় মাস গণ্য হবে বরং হযরত হাসান (রা.)’র খিলাফতকালে। কারণ বৈধ খলিফা হিসেবে হেজাজের পবিত্র স্থানসমূহের জনগণসহ বেশিরভাগ প্রদেশের গভর্নরবৃন্দ হযরত হাসান (রা.)’র পবিত্র হস্তে বায়াত করেছিলেন’। সহীহ মতানুযায়ী হযরত হাসান (রা.) ২০ রমযান ৪০ হিজরী সন থেকে ১৫ জমাদিউল আউয়াল ৪১ হিজরী সন পর্যন্ত মোট সাত মাস ছাব্বিশ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত হাসান (রা.)’র খিলাফত সময়ে সামান্য রক্তপাতও ঘটেনি। এক শিংগা পরিমাণ রক্তও ঝরেনি। তাঁর খিলাফতের পূর্বে হযরত উসমান (রা.)’র শাহাদত, উস্ত্রের যুদ্ধ, সিফফিনের যুদ্ধ, নাহরাওয়ানের যুদ্ধে হাজার হাজার লোক এবং যোদ্ধার রক্তের বন্যায় ভেসে যায় বসরা, সিফফিন এবং নাহরাওয়ানের প্রান্তর। উম্মাহর অভ্যন্তরে কলহ-বিবাদ, কোলাহল প্রবল নৈরাজ্য আকার ধারণ করে যে, সর্বত্র অবিশ্বাস, অনৈক্য, ফিতনা-ফ্যাসাদে ইসলাম ধর্মের মূল চেতনা এবং আবেদন লুপ্ত হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। একদিকে দামেস্ক থেকে আমীর মুয়াবিয়ার সমরাভিযান অন্যদিকে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ রক্ষার নিমিত্তে হযরত ইমাম হাসান (রা.) রণ প্রস্তুতি সবমিলে মুসলিম সম্রাজ্যের সর্বত্র রণ নাকড়া বেজে ওঠে। আমীর মুয়াবিয়া ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন রাজনীতিক। রাজনীতির মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ এবং এ লক্ষ্য অর্জনের পথে যেকোন বাধা বিপত্তি অপসারণে ব্যাপক রক্তপাতসহ সকল প্রকার অনৈতিক, ভ্রষ্টপথ, কুটনীতি, সুবিধাবাদী পন্থা অবলম্বন করা বৈধ। গ্রীক-রোমান-পারস্য রাজনীতির ধারাপাতে অভিজ্ঞ আমীর মুয়াবিয়া ক্ষমতা কেন্দ্রিক যুদ্ধাভিযান

সফল করার লক্ষ্যে খোলাফায়ে রাশেদীনের পঞ্চম খলিফাকে অধৈর্য করার কর্মসূচিকে অগ্রবর্তী করেন। সিরিয় বাহিনীর গুপ্তচর হযরত হাসান (রা.)’র সমর্থক বাহিনীর মধ্যে নানা রকম অপপ্রচারে এবং বিভ্রান্তি ছড়িয়ে খোদ ইমাম (রা.)’র জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলে। গুপ্তচরের প্ররোচনায় হযরত ইমাম হাসান (রা.)’র শিবির লুণ্ঠিত হয়। কুফার লোকদের চঞ্চল স্বভাব, অস্থির মনোবস্থা এবং সুবিধাবাদীতা আমীর মুয়াবিয়ার আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে সুস্পষ্ট বিজয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

হযরত উসমান (রা.)’র শাহাদতের পর খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে হযরত আলী (ক.)’র উপর জনগণের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড চাপ আসতে থাকে। বিভিন্ন সাহাবা এবং জনগণের পক্ষ থেকে প্রবল চাপের মুখে হযরত আলী (ক.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে প্রস্তুতি নিলে হযরত হাসান (রা.) পিতার প্রতি আবেদন পেশ করে বলেন, “যতক্ষণ পর্যন্ত খিলাফতের আওতাধীন রাজ্যসমূহের সাধারণ জনগণের পক্ষ থেকে খলিফা পদ গ্রহণের জন্যে আপনার প্রতি আবেদন পেশ করা হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি তা কবুল না করে বিরত অবস্থায় অপেক্ষারত থাকুন”। কিন্তু মদিনার অভ্যন্তরে বিদ্রোহী বাহিনী বেদুঈন এবং ক্রীতদাসদের লুণ্ঠন ও নৈরাজ্যের ভয়ানক অবস্থা লক্ষ্য করে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে হযরত আলী (ক.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পরপর হযরত উসমানের (রা.) বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূল কারণ হিসেবে প্রাদেশিক গভর্নরদের দায়িত্বহীন কার্যকলাপ দুর্নীতি এবং স্বজন-স্বগোত্র প্রীতিকে চিহ্নিত করা হয়। তাই হযরত আলী (ক.) খলিফা হিসেবে শপথ গ্রহণের পরপর তাঁর বিশ্বস্ত এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়োগদান করে পূর্ববর্তীদের বরখাস্ত করেন। মুগিরা ইবনে শে’বা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ সমাজ এবং রাজনীতি সচেতন অনেক সাহাবা হযরত আলী (ক.)-কে উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখতে অনুরোধ জানান। বিচক্ষণ রাজনীতিক এবং কৌশলী হযরত মুগিরা ইবনে শে’বা মওলা আলী (ক.)’র প্রতি নিবেদন রেখে বলেন, “আগে সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা হোক, সবাই মেনে নিক আপনার খিলাফত। সাম্রাজ্যব্যাপী সুপ্রতিষ্ঠিত হোক খলিফার আসন, প্রত্যন্ত প্রদেশের মানুষগুলো আপনার বায়াত নিক। তখন প্রশাসনিক রদবদলে হাত দিন”। হযরত আলী (ক.) এতে কর্ণপাত করেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হজ্জ থেকে ফিরে এসে একই ধরনের অনুরোধ জ্ঞাপনের পাশাপাশি অন্তত সিরিয়ার গভর্নর আমীর মুয়াবিয়াকে না ঘাঁটানোর পরামর্শ দিয়ে বলেন, “সিরিয়ায় আমীর মুয়াবিয়া খুবই জনপ্রিয়। তার আহ্বানে সিরিয়াবাসী আপনার খিলাফত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। হযরত আলী (ক.) স্পষ্ট জানিয়ে

দেন, “আমীর মুয়াবিয়াকে একদিনও সিরিয়া রাখতে প্রস্তুত নই”। উপর্যুক্ত সাহাবা কেরামের রাজনৈতিক পরামর্শের সঙ্গে হযরত হাসান (রা.)ও সম্মতি পোষণ করে হযরত আলী (ক.)-কে একই অনুরোধ জানিয়েছিলেন। হযরত আলী (ক.)’র খিলাফতের শুরুতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে যখন চক্রান্ত ঘড়যন্ত্র এবং রণ নাকড়া শুরু হয়, তখন হযরত ইমাম হাসান (রা.) তাঁর মহান পিতাকে খিলাফত পরিত্যাগের পরামর্শও দিয়েছিলেন। হযরত হাসান (রা.)’র এ ধরনের অনুভূতি প্রবণ পরামর্শের মধ্যে সহজ, সরল, শান্ত স্বভাবের চারিত্রিক ধারার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। উষ্ট্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে সৈন্য সংগ্রহের মানসে হযরত আলী (ক.) কুফায় পত্র মারফত লোক পাঠান। একইভাবে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)ও হযরত উসমানের রক্তের বদলা গ্রহণের সংবাদ প্রেরণ করলে কুফাবাসীদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কুফার গভর্নর হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.)ও দ্বিধা দ্বন্দ্ব পতিত হয়ে কোন পক্ষে যোগ না দেয়ার পরামর্শ দিয়ে সবাইকে নিরপেক্ষ থাকার আহ্বান জানান। কুফাবাসীদের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে হযরত আলী পুনরায় দূত পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানালে কোন সাড়া মিলেনি। অগত্যা হযরত আলী (ক.) হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.)’র সঙ্গে হযরত হাসান (রা.)-কে কুফায় প্রেরণ করেন। স্বয়ং রাসূলে করিম (দ.)’র দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.) জনগণের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন, “হে সমবেত জনগণ, হে উপস্থিত ও অনুপস্থিত কুফাবাসীগণ, আপনারা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিন, খলিফার আনুগত্যে স্থির থাকুন, দেশকে দুর্যোগ হতে রক্ষা করুন, ইসলামের পতাকাকে তুলে ধরুন, যদি আপনারা বোঝেন আমরা সত্য বলছি, তাহলে আমাদের সাহায্য করুন। যদি বোঝেন আমার পিতা আলী’র তলোয়ার চিরদিন ছিল অন্যায়ে বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে এবং ইসলামের খেদমতে, তাহলে সেই ন্যায়-নিষ্ঠ খলিফাকে আজ আপনারা সাহায্য করুন”। তাঁর বক্তৃতা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কুফার অলিতে গলিতে ব্যাপক আলোড়ন-জনজোয়ার ও কর্ম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কুফার জনগণ নিরপেক্ষতা ভেঙ্গে হযরত আবু মুসা আশআরীকে পদচ্যুত করেন এবং খলিফা হযরত আলী (ক.)’র পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের লক্ষ্যে দশ সহস্র সৈন্য প্রস্তুতি নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। এটি ছিল রাসুল (দ.) দৌহিত্র হযরত হাসান (রা.)’র প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থন, শ্রদ্ধা এবং সম্মানের বহিঃপ্রকাশ।

হযরত হাসান (রা.) ছিলেন সুবক্তা। সুমিষ্ট স্বরে সাবলীল ভাষায় প্রচুর যুক্তি উপস্থাপনের যোগ্যতার কারণে তাঁকে

সকলেই মনে করতেন, খুত্বা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি হযরত আলী (রা.)’র অনুলিপি। একদিন হযরত আলী (ক.) হযরত হাসান (রা.)-কে বলেন, “প্রিয় পুত্র, তুমি একটু খুত্বা দাও। আমি তা শুনবো”। প্রত্যুত্তরে হযরত হাসান (রা.) বলেন, “আব্বা, আপনি সামনে থাকলে আমার তো খুত্বা দিতে লজ্জা করে”। পুত্রের মনোভাব লক্ষ্য করে হযরত আলী (রা.) আড়ালে গিয়ে বসে খুত্বা শোনার জন্যে উদ্বীবি হয়ে থাকেন। অতঃপর হযরত হাসান (রা.) খুত্বা শুরু করেন। হযরত হাসান (রা.) একটি সারগর্ভ এবং সুন্দর খুত্বা প্রদান করেন। খুত্বা শেষ হবার পর অত্যন্ত তৃপ্ত মনে হযরত আলী (ক.) আড়াল থেকে বের হয়ে বলে ওঠেন, “এরা একে অপরের বংশধর, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বোত্তম”। মুহাম্মদ ইবনে সা’দ হাওদাও ইবনে খলিফাহ মুহাম্মদ সীরি থেকে বর্ণনা করেছেন, “আমীর মুয়াবিয়া কুফায় গিয়ে হযরত হাসান (রা.)’র সঙ্গে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করেন। সে সময় এ স্থানে অসংখ্য লোক-সমাগম হয়। এ সময় আমীর মুয়াবিয়ার পক্ষের লোকজন তাঁকে (মুয়াবিয়া) বলেন, তিনি যেন হযরত হাসান (রা.)-কে ভাষণ দানের আহ্বান জানান। তাদের ধারণা ছিল হযরত হাসান (রা.) অল্প বয়সী যুবক। এতো লোকের সম্মুখে ভাষণ দিতে ইতস্তত করবেন। হয়তো অপারগতা প্রকাশ করবেন। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে হযরত হাসান (রা.)’র জনপ্রিয়তা হ্রাস পাবে। সমর্থকদের দাবীর প্রেক্ষিতে আমীর মুয়াবিয়া হযরত হাসান (রা.)-কে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানান। হযরত হাসান (রা.) আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ছানা-সিফাত বর্ণনার পর বলেন, “হে লোক সকল, আপনারা যদি সুদূর জাবলাক নগরী ও জাবরাম নগরীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে এমন একজন পুরুষ লোক খোঁজেন যাঁর নানা স্বয়ং নবী করিম (দ.), তাহলে আমি আর আমার ভাই [হোসাইন (রা.)] ব্যতীত কাউকে পাবেন না। এই মূহুর্তে আমরা আমীর মুয়াবিয়ার প্রতি সাম্রাজ্যের দায়িত্ব হস্তান্তর করছি এই ভেবে যে, মুসলমানদের রক্তপাত ঘটানোর চাইতে রক্তপাত বন্ধ করা কল্যাণকর।” আমীর মুয়াবিয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে হযরত হাসান (রা.) বলেন, “তবে আমি জানি না, এটি আপনারদের জন্যে পরীক্ষা এবং অল্পদিনের ভোগ-বিলাসও হতে পারে”। হযরত হাসান (রা.)’র বক্তৃতার সারমর্ম অনুধাবন করে আমীর মুয়াবিয়া রাগতঃ কণ্ঠে বিরক্তি সহকারে প্রশ্ন করেন, “এটি দ্বারা আপনি কী বুঝাতে চেয়েছেন? উত্তরে হযরত হাসান (রা.) বলেন, “আমি তা-ই বুঝাতে চেয়েছি, তা দ্বারা আল্লাহ তা’আলা যা বুঝিয়েছেন”। এরপর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে

আমীর মুয়াবিয়া খুত্বা প্রদান করেন। বর্ণনাকারীরা উল্লেখ করেন বিশাল জনসমাগমে যারা হযরত হাসান (রা.)-কে বক্তৃতা প্রদানের সুযোগ দিতে আমীর মুয়াবিয়াকে পরামর্শ দিয়েছিল হযরত হাসান (রা.)'র বক্তৃতার মর্মার্থ বুঝিয়ে দিয়ে আমীর মুয়াবিয়া পরবর্তী সময়ে তাদেরকে তিরস্কার করেন।

খোলাফায়ে রাশেদীনের ৪র্থ খলিফা হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা.) খারিজী গুপ্তঘাতক ইবনে মুলজিম কর্তৃক আহত হবার পর শাহাদত বরণ করলে হযরত হাসান (রা.) শোকার্ত জনতার উদ্দেশ্যে তত্ত্ব-তথ্য নির্ভর আবেগপ্রবণ ভাষায় এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি বলেন, “হে লোক সকল, আপনাদের মধ্য হতে আজ সেই মহাপুরুষ বিদায় গ্রহণ করেছেন, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও পরিলক্ষিত হয়নি, পরেও হবে না। বিখ্যাত নবী হযরত মুসা (আ.) এ রাতেই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। আর হযরত ঈসা (আ.) এ রাতেই আসমানে গমন করেছেন। আমার পিতা হযরত আলী (ক.) বিশ্ববাসীকে আল্লাহর দীনের দিকে আহ্বান জানাতেন, আমিও আপনাদেরকে সে দিকেই আহ্বান জানাচ্ছি”। মূলতঃ হযরত হাসান (রা.) ছিলেন সারগর্ভ বক্তব্য প্রদানের সক্ষম অত্যন্ত সফল ব্যক্তিত্ব।

হযরত হাসান (রা.) ৪০ হিজরীর ২০ রমযান থেকে ৪১ হিজরীর ১৫ জমাদিউল উলা পর্যন্ত মোট সাতমাস ছাব্বিশ দিন খোলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র দায়িত্ব পরিচালনা করেন। এ সময় সিরিয়া থেকে আমীর মুয়াবিয়া বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে খিলাফত দখলের লক্ষ্যে কুফার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। পশ্চিমধ্যে বায়তুল মোকাদ্দাসে যাত্রা বিরতি করে আমীর মুয়াবিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের আমীর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে হযরত হাসান (রা.) কুফার জামে মসজিদে অসংখ্য লোক সমাগমের মধ্যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অনুরোধ এবং সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে খোলাফায়ে রাশেদীদের খলিফা হিসেবে শপথ নেন। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) নবুয়তের পর ত্রিশ বছর খিলাফত বলবত থাকবে বলে ইতিপূর্বে ঘোষণা দিয়েছিলেন। দিনকালের হিসাব অনুযায়ী হযরত হাসান (রা.)'র সময়কাল সহ ‘পাঁচ মহাত্মাজনের খিলাফতকাল’ বরাবর ত্রিশ বছর পরিপূর্ণ হয়েছে। আমীর মুয়াবিয়া আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (ক.)'র বিরুদ্ধে সিফফিনের যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে বর্শা ফলকে পবিত্র কুরআন উত্তোলন করে যে ধরনের কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছিলেন, হযরত হাসান (রা.)'র বিরুদ্ধেও গুপ্তচর লেলিয়ে দিয়ে খলিফার বাহিনীর মধ্যে বিভ্রান্তি এবং ভাঙ্গন ধরাতে সচেষ্ট হন। হযরত হাসান

(রা.) যখন তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে আমীর মুয়াবিয়ার আত্মসন প্রতিরোধ করতে অগ্রবর্তী হলেন তখনই সিরিয়ার গোয়েন্দা এবং গুপ্তচরদের দুরভিসন্ধিতে প্রলুদ্ধ প্ররোচিত হয়ে অস্থির চিত্তের কুফাবাসী সেনাদের বড় অংশটি হযরত হাসান (রা.)'র সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরায়। এক পর্যায়ে এরা হযরত হাসান (রা.)'র শিবিরে আক্রমণ করে। এতে হযরত হাসান (রা.) হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন। হযরত হাসান (রা.)'র বিরুদ্ধে আমীর মুয়াবিয়ার এ ধরনের কুটপদক্ষেপ নেয়ার কারণ ছিল, যেভাবে হোক সরাসরি যুদ্ধ ব্যতিরেকে হযরত হাসান (রা.)'র সঙ্গে সন্ধিস্থাপনের মাধ্যমে মুসলিম সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ। কারণ আমীর মুয়াবিয়া জানতেন হযরত হাসান (রা.) বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র পবিত্র শোণিতের উত্তরাধিকার। যুদ্ধক্ষেত্রে হযরত হাসান (রা.) যদি আমীর মুয়াবিয়ার বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে শাহাদত বরণ করেন এতে যে গণজাগরণ সৃষ্টি হবে তাতে মুয়াবিয়ার পক্ষে মসনদ টিকিয়ে রাখা কখনো সম্ভব হবে না। একই সঙ্গে হযরত আলী (ক.) স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদান করে উল্লেখ করেছিলেন, “পারত পক্ষে জীবনে যুদ্ধ পরিহার করে চলবে। তবে আক্রান্ত হলে অবশ্যই প্রতিহত করবে। মনে রেখো, যুদ্ধের সূচনাকারী নিঃসন্দেহে অপরাধী”।

মুসলিম সাম্রাজ্যে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমীর মুয়াবিয়া হযরত হাসান (রা.)-কে রাজী করানোর লক্ষ্যে দূত মারফত পত্র প্রেরণ করেন। সার্বিক পরিস্থিতি উপলব্ধি করে হযরত হাসান (রা.) জানান, “এ কথা অনস্বীকার্য যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আমাদের পিতামহ হযরত মুহাম্মদ (দ.)'র মাধ্যমে আপনাদেরকে পরিচালিত করেছেন। যিনি অজ্ঞতা ও অন্ধকার থেকে আপনাদেরকে উদ্ধার করেছেন। আমাকে যে বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে, নিশ্চয়ই আমীর মুয়াবিয়া তাতে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন এবং আমি এ বিষয়ে কারো সমর্থন পাইনি। অতএব, শান্তি বজায় রাখা ও রক্তপাত ঘটতে না দেয়ার জন্য আমি আমার রাজনৈতিক ক্ষমতাটুকু খণ্ডকালীন সময়ের জন্যে আমীর মুয়াবিয়ার নিকট হস্তান্তর করছি”।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) আমীর মুয়াবিয়ার নিকট কিছু সময়ের জন্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর একটি সুস্পষ্ট পারস্পরিক অঙ্গীকারনামা তথা চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। চুক্তির শর্ত সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবে ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। কেউ লিখেছেন শর্ত ৮টি, কেউ ১০টি শর্তের বিবরণী দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ ১২টি ধারা বর্ণনা করেছেন। শর্তের সংখ্যা যাই হোক না কেন, সবগুলোর

ভাবার্থ প্রায় একই ছিল। আমীর মুয়াবিয়া এবং আহলে রাসুল (দ.) হযরত হাসান (রা.)'র মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলি অবহিত হলে খিলাফতে রাশেদীন পরবর্তী ঘটনাসমূহের যথার্থ কারণ নির্ণয় যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সহজ হবে বিধায় নিম্নে চুক্তির শর্তাদি উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত হাসান (রা.) ইসলামী সাম্রাজ্যের শাসন ভার (খিলাফত নয় বরং সরকার পরিচালনা) আমীর মুয়াবিয়ার নিকট এই শর্তে হস্তান্তর করবেন যে, আল্লাহর নির্দেশ রাসুল (দ.)'র সুন্যাহ এবং পূর্ববর্তী ন্যায়পরায়ণ খলিফাদের অনুসরণে রাজ্য পরিচালনা করবেন।

২. ভবিষ্যতে হযরত হাসান (রা.)'র নিকট ব্যতীত আর কাউকে আমীর মুয়াবিয়া এই শাসনভার হস্তান্তর করতে পারবেন না। হযরত হাসান (রা.)'র অবর্তমানে তা হযরত হোসাইন (রা.)-কে হস্তান্তর করতে হবে। উপর্যুক্ত শর্ত সম্পর্কে ভিন্ন এক ধরনের শব্দ সংকলন কোন কোন ইতিহাসবিদ করেছেন। এতে উল্লেখ রয়েছে, “তিনি (আমীর মুয়াবিয়া) পবিত্র কোরআন হাদিসের ভিত্তিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতিতে শাসন পরিচালনা করবেন। কপ্পিনকালেও এর ব্যতিক্রম করবেন না। এর অন্যথা করলে মুসলিম জনসাধারণ তাদের মতে অন্য কাউকে খলিফা নির্বাচিত করতে পারবেন। আর মুয়াবিয়া তার অবর্তমানকালের জন্য কোন উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতে পারবেন না, তা মুসলিম জনসাধারণের অনুমতিক্রমে সম্পন্ন হবে।

৩. আমীর মুয়াবিয়া ‘আমিরুল মুমিনীন’ হিসেবে সম্বোধিত হবেন না।

৪. হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (ক.)'র প্রতি যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করার লক্ষ্যে তাঁকে গালি-গালাজ করা যাবে না।

৫. হযরত হাসান এবং হযরত হোসাইন (রা.) সহ আহলে বাইতে রাসুল (দ.) সদস্যদের বিষয়ে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রমূলক কিংবা আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করা যাবে না।

৬. আহলে বাইতের অনুসারীদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের বিষয়ে কোন প্রকার প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

৭. সাম্রাজ্যের সকল অধিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অতীতের কর্মকাণ্ডের কারণে কারো বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ইরাকীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

৮. সকল মানুষের হারানো অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. জঙ্গ জামাল এবং সিফফিনে যাঁরা শাহাদত বরণ

করেছেন, তাঁদের সন্তান এবং আহলে বাইতের অনুসারী দরিদ্র নিঃস্ব-মানুষের সাহায্যের লক্ষ্যে আহওয়ায প্রদেশের যাবতীয় রাজস্ব হযরত হাসান (রা.)'র জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে।

১০. হযরত হোসাইন (রা.)'র জন্যে বার্ষিক দু'লক্ষ দিরহাম পৃথকভাবে প্রদান করতে হবে।

১১. কুফার রাজকোষে যে পরিমাণ অর্থ জমা আছে, তা হযরত হাসান (রা.) প্রাপ্য হবেন। এ ছাড়া স্বীয় খরচ নির্বাহের জন্যে হযরত হাসান (রা.)-কে প্রতি বৎসর এক লক্ষ দিরহাম প্রদান করা হবে।

১২. উপহার-উপটোকন বিতরণের ক্ষেত্রে বনু হাশিমকে বনু উমাইয়ার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

উপর্যুক্ত সন্ধির অনুকূলে হযরত হাসান (রা.) ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় জনগণকে অবহিত করে বলেন, “হে লোক সকল, আল্লাহ পাক আমাদের পূর্ববর্তীদের মাধ্যমে আপনাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন এবং পরবর্তী লোকদের মাধ্যমে আপনাদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করেছেন। হ্যাঁ সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা হলো তাকওয়া। আর অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাসমূহের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব হলো বদ আমল বা মন্দ কর্ম। খিলাফত নিয়ে আমার এবং মুয়াবিয়ার মধ্যে যে মতভেদ ছিলো তা ছিলো এ বিষয়ে যে, খিলাফতের জন্য তিনি আমার তুলনায় বেশি হকদার অথবা এতে আমার হক বেশি ছিলো-এ প্রশ্ন নিয়ে “আমার হক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, উম্মতে মুহাম্মদীর কল্যাণ এবং আপনাদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করার খাতিরে পরিত্যাগ করেছি”। আমীর মুয়াবিয়ার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে হযরত হাসান (রা.) বনু হাশিমের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে হযরত জাফর তাইয়ার (রা.)'র পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.) সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে হযরত হাসান (রা.) বলেন, “আমি মদিনায় চলে যাব এবং সেখানেই অবস্থান করবো বলে ঠিক করেছি। আর রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্ব আমীর মুয়াবিয়ার হস্তে সোপর্দ করবো এ জন্যে যে, বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রক্তপাতের ফলে সমঝোতার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে”। উত্তরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা.) বলেন, “উম্মতে মুহাম্মদীর পক্ষ হতে আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন”। আমীর মুয়াবিয়ার নিকট রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়টি হযরত হোসাইন (রা.)-কে অবহিত করলে তিনি বলেন, “আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অর্থাৎ এমনটি করা ঠিক হবে না”। অবশ্য হযরত হাসান স্বীয় প্রজ্ঞা গুণে হযরত হোসাইন (রা.)-কে নিজের সিদ্ধান্তের অনুকূলে আনেন। (চলবে)

নীরবতা এবং বাবাজান কেবলা হযরত শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন

“তিনি কে, যিনি প্রতিভাত হচ্ছেন সুন্দর পর্দার পিছনে।
তিনি কে, যিনি মুখের পর্দা একটি একটি করে সরিয়ে
ফেলছেন”। (দিওয়ানে মঈনুদ্দিন,)
পৃথিবী একটি কোলাহলপূর্ণ ও শব্দপূর্ণ জায়গা। এখানে
প্রত্যেকের আধ্যাত্মিকতার পথে বিকাশ লাভ করা হয়ে উঠে
না, কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে যে নীরবতা ও নির্জনতার
অনুভূতি রয়েছে তার মাধ্যমে সে পর্দার অন্তরালে থাকা মহান
শক্তির সন্ধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। মানব মনের
অভ্যন্তরীণ কণ্ঠস্বর প্রত্যেককে সে অভাব অনুভব করতে
শেখায়। যুগে যুগে মানব এই অনুভবের মাধ্যমে নিজেকে
নিরবতায় আর নির্জনতায় বিলিয়ে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে
সকলে মহান শক্তির সৌন্দর্য অবলোকনের অনুভবের সাক্ষী
হয়ে যায়। সৌন্দর্য সর্বদা পর্দার অন্তরালে লুকায়িত, চাদরের
আবরণে অদৃশ্যমান। সৌন্দর্যের মূল মালিক মহান রাক্বুল
আলামিন আল্লাহ তায়ালা সৌন্দর্য যুগে যুগে তাঁর প্রতিনিধির
মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে আসছে। প্রতিনিধিগণ নির্জনতায়
নীরবতার মাধ্যমে এই সৌন্দর্য অবলোকন করে বিস্মিত হন,
অতঃপর সৌন্দর্য নিজের মধ্যে ধারণ করেন। নিরবতা ও
নির্জনতা গ্রহণের শিক্ষা এসেছে রাসুলে পাক (দ.) হতে।
নবুয়ত প্রকাশের পনের বছর পূর্ব হতেই রাসুলে পাক (দ.)
হেরা গুহায় দিনের পর দিন, এমন কি মাসাধিক কাল পর্যন্ত
ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। রাসুলে পাক (দ.) শরীয়তের শিক্ষার
পাশাপাশি তাসাওউফের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি নিজেও চর্চা
করে দেখিয়েছেন। তিনি চিরদিনই অনাড়ম্বরতা পছন্দ
করতেন, অল্প আহার, অল্প নিদ্রা, অল্প কথা বলা তাঁর অভ্যাস
ছিল। তিনি অত্যধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরে মশগুল
থাকতেন, দীর্ঘ সময় ধরে মোরাকাবা ও মোশাহেদায় মগ্ন
থাকতেন। বাল্যকাল হতেই রাসুলে পাক (দ.)’র নীরবতা ও
নির্জনতার প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁকের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে
আল্লামা হালবী (র.) উল্লেখ করেছেন, “বাল্যকাল হতেই
ইবাদত ও নির্জনতার প্রতি রাসুলে পাক (দ.)-এর বিশেষ
আকর্ষণ ছিল” (আস সীরাতুল হালাবীয়াহ)। নবুয়ত
প্রকাশের সময় যখন ঘনিয়ে আসছিল, তখন নির্জনতার প্রতি
রাসুলে পাক (দ.) ঝোঁক আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এ
প্রসঙ্গে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, “নির্জনতা

অবলম্বন রাসুলে পাক (দ.)-এর নিকট মনঃপুত হয়ে গেল
এবং তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন হয়ে তাহান্নুস (এক প্রকার
ইবাদত) করতেন। সেখানে রাসুলে পাক (দ.) অসংখ্য রাত
কাটিয়ে দিতেন” (বুখারী শরিফ)। তিনি আরো বলেন,
আল্লাহ তায়ালা রাসুলে পাক (দ.) এর অন্তরে একাকীত্ব
যাপনকে প্রিয় বানিয়ে দিলেন। এমনকি নির্জনবাসের চেয়ে
রাসুলে পাক (দ.)’র নিকট অতি প্রিয় আর কোন কাজ ছিল না
(আস সীরাত, ইবনুল হিশাম)।
রাসুলে পাক (দ.)-এর নির্জনবাসের নির্যাস আজও
সুফিজনের মাঝে বহমান। সুফিজন নীরবতা অবলম্বন করে
পর্দার অন্তরালে বাস করেন। লোকচক্ষুর সম্মুখে তাঁদের
অবস্থান হলেও সৌন্দর্যের প্রকাশ প্রথা কঠিন। মূলত নির্জনতা
আর নীরবতার অন্তরালে সুফিদের সৌন্দর্য লুকায়িত থাকে।
তাসাওউফ পরিমণ্ডলে অন্যতম নীরব সাধক তুরিকায়
মাইজভাণ্ডারীয়ায় নীরবতার চাদরে আবৃত প্রস্ফুটিত সুরভিত
ফুল কুতবুল আকতাব হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ
গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রকাশ বাবাজান কেবলা
(১৮৬৫-১৯৩৭)। তিনি তুরিকায় মাইজভাণ্ডারীয়ার প্রবর্তক
ইমামুল আওলিয়া গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত
মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (ক.) কেবলা
কাবার (১৮২৬-১৯০৬) কুতবিত ধারামতে ফয়েজপ্রাপ্ত
মগলুবুল হাল মাদার মসরব অলিআল্লাহ। অছিয়ে গাউসুল
আযম হযরত মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র ভাষায়, “তিনি (বাবাজান কেবলা)
কথাবার্তা পরিহারী বিভোর চিত্ত ভাষাভূলা অলিউল্লাহ
ছিলেন”। রাসুলে পাক (দ.)-এর সুনুতের অনুসরণে তিনি
নীরবতা ও নির্জনতাকে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন। তিনি
তাসাওউফ পরিমণ্ডলে এক নীরব দীপ্তিময় আলোকবর্তিকা।
সুফিদের নির্জনতা কী? সুফিগণের আচরিত কাজ বিবেচনায়
নির্জনতা দুইভাগ। এক. সমাজে অবস্থানের মাধ্যমে সামাজিক
ব্যস্ততা হতে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া। দুই. সামাজিক
ব্যস্ততা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন স্থানে অবস্থান করা।
বাবাজান কেবলা তাঁর নিজ পীর হযরত গাউসুল আযম
মাইজভাণ্ডারী (ক.)’র প্রতি পতঙ্গতুল্য আশেক ছিলেন।
মুর্শিদের প্রেমে প্রেরণাধিক্যের গুরু হতে তিনি নিজেকে

পরিবার ও সামাজিক ব্যস্ততা হতে আস্তে আস্তে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি একদিন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জারীর কদম শরিফ এমনভাবে জড়িয়ে ধরলেন যে ছাড়িয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল। এরপর হযরত সাহেবানী (র.)'র পরামর্শে হযরত বাবাজান কেবলা ছায়েরে (ভ্রমনে) বের হন। এরপর বাবাজান কেবলা নির্জনতায় নিজেকে বিলীন করেছিলেন। তিনি যেন অন্য এক পৃথিবীর অভিবাসী। পরিবারের, সংসারের, সমাজের একজন হয়েও তিনি নিরুদ্দেশের বাসিন্দা হয়েছেন নির্জনতার লক্ষ্যে। হেরা গুহার ন্যায় নির্জন স্থানে বাবাজান কেবলা স্রষ্টার প্রকৃত স্বরূপ খুঁজতে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। ১৮৯৪ সাল হতে তিনি বারো বৎসরাধিক কাল কঠোর সাধনাকাল পার করেছেন।

সুফিদের নীরবতা কী? শব্দহীনতা ও স্বল্পভাষিতা হওয়াই সুফিদের নীরবতার সংজ্ঞা। পরিমাপযোগ্য কথা কিংবা আক্ষরিক শব্দত্যাগ করে ইশারা ইঙ্গিতে কার্য সম্পাদন। একজন সুফির নীরবতা শুধুমাত্র কথা বলা পরিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁরা শরীর, মন ও আত্মার স্থিতির ভারসাম্য বজায় রেখে কেবলমাত্র অপ্রয়োজনীয় কথা ও আচরণ হতে বিরত থাকেন। বাবাজান কেবলা তাসাওউফ পরিমণ্ডলে নীরবতার চাদরে নিজেকে লুকিয়ে নিয়েছেন। সুখে কিংবা দুঃখে, আনন্দে কিংবা ব্যথায় তিনি নিজ জবান বন্ধ রেখেছিলেন। প্রবল ধৈর্য্য ও সংযমবলে সকল অনুভূতি নিজ অন্তরে গোপন করে রেখেছিলেন। নীরবতা তাঁর মনে অন্তর্দৃষ্টির জন্ম দিয়েছিল এবং এই অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই স্রষ্টাকে অনুভব করতে খোরাক জুগিয়েছে। ১৯০৬ সালে নিজ মুর্শিদ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাঞ্জারী (ক.)'র ওফাতের পর তিনি নিজের গদীতে অবস্থান গ্রহণের প্রথম দুই বছর পর হতেই স্বীয় জবানে কথাবার্তা প্রায় বন্ধ করে দেন এবং ওফাতের পূর্ববর্তী তেইশ বছরের বেশি সময় ধরে নিজ জবান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখেন।

সুফিদের নীরবতার শক্তি কি সক্রিয়? হ্যাঁ, সক্রিয়। কারণ সুফিদের নীরব থাকা মানে নেতিবাচকতা নয়, বরং এই নীরবতায় স্রষ্টার প্রেমযোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সুফিদের নীরবতার মাধ্যমে তাঁরে রুহানী সক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। হেরা গুহায় রাসুলে পাক (দ.)-এর নীরবতা তাঁর স্রষ্টার সাথে মিলনের মিষ্টতা জুগিয়েছে। আবার পরিবারে, সমাজে কিংবা দেশে রাসুলে পাকের (দ.) নীরবতা রহমত বিলিয়েছে। সুফিদের এই সুলভ পালনের ধারার যুক্ততা প্রমাণ করে সুফিগণ নীরব থাকলেও তাঁদের রুহানী তাওয়াজ্জাহ, বরকত, দোয়া চলমান থাকে। বাবাজান কেবলার নির্জনতা ও

নীরবতা অনেকটা অপ্রাপ্য দুঃসাহসিক কল্পনার মতো মনে হবে সাধারণ মানুষের কাছে। তাঁর চারপাশের উদগ্রীব, অভাবী, সমস্যাগ্রস্ত এত লোকের মাঝে তিনি নিখুঁত মাধুর্যের সাথে নীরবতাকে সঙ্গী করেছেন বলেই নীরবতার চাদরে লুকিয়ে থাকার পরও তাঁর কাছে আগত অগণিত দুর্গত মানুষ, ভক্ত, জায়েরীন, আশেকীন তাঁর ভালবাসা, বরকত, ফুয়ুজাত, দোয়ায় সিক্ত হতে থাকেন।

সুফিদের নীরবতার ভাষা প্রতিটা ক্ষণে ক্ষণে শব্দের জন্ম দেয়, রহস্যবাদীদের অন্তরে প্রতিনিয়ত নতুনতর ভাবনা সৃষ্টি করে, ভাষা সৃষ্টি করে। বাবাজান কেবলার নীরবতা আমাদের ভাবতে শেখায়, চিন্তার দুনিয়ায় স্রষ্টার জ্ঞানের শহরে ভ্রমণের বাহনে আরোহন করতে শেখায়। তাসাওউফ জগতে আগ্রহান্বিতদের ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক পথে বিকশিত হতে সক্ষম করে।

বাবাজান কেবলার নীরবতার শান-মান ব্যক্ত হয়েছে আশেক-ভক্ত-ফকিরের গীত-গজলে, সন্ধানীর নতুনতর তথ্যে ও তত্ত্বে। বাবাজান কেবলা ছাত্রাবস্থায় স্রষ্টার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আকৃতির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন চতুর্দশপদী ফার্সী শে'র লিখে। এই শে'র এ বাবাজান কেবলার নীরবতা পালনের আক্ষরিক উদ্দেশ্য প্রকাশিত হয়েছে।

“বহু বছর ধরে আমি তোমার (আল্লাহর) সন্ধানে আছি, আমার প্রাপ্য এখনও তুমি পূর্ণ করছো না, আমি দৈববাণীযোগে জানলাম, তোমার দুয়ার হতে কেউ নৈরাশ হয়ে ফিরে যায়নি, যে ব্যক্তি তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছে, সে কখনও বিফল মনোরথে ফিরে যায় না, যে ব্যক্তি তোমার দুয়ারে আশার আলো নিয়ে হাজির হয়েছে, সে তার মন্জিলে মকছুদে পৌঁছবেই।

হে খোদা, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এবং তাঁর প্রিয়জনদের উসিলায়

আমি প্রার্থনা জানাই-

আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করো এবং হাশরের দিন রসূলে খোদা (দ.)-এর অনুসারী বংশধরগণের সাথে আমাকে স্থান দিও আর তোমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের উসিলায় আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর কর'।

লেখক গুণাহ্গার খাদেম
উৎসর্গকৃত গোলামে রহমান
(তাকে ক্ষমা করা হোক)
জামাতে সিয়াম

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র জীবনাদর্শে তাসাওউফ ও হক্কুল ইবাদের প্রাসঙ্গিকতা: মুহাম্মদ ওহীদুল আলম

পৃথিবীর মানুষের কানে দুটো বিশেষ বাঁশির সুর প্রবিষ্ট হয়েছে অবলীলায়। ইতিহাসের বুকো বাঁশি দুটো করে নিয়েছে অক্ষয় ঠাই। তবে ভিন্ন আদলে, গুণগত ব্যবধানে, মানগত অবস্থানে ও আবেদনের স্বতন্ত্র তটরেখায়। একটি বাঁশি হচ্ছে নীরোর, অন্যটি রুমীর। নীরো বাঁশি বাজিয়েছিলেন তোয়াক্কাহীন মনের বেপরোয় আনন্দে, যখন রোম পুড়ছিল দাউ দাউ আগুনে। আর রুমী বাঁশি বাজিয়েছিলেন তাঁর আত্মা যখন পুড়ছিল প্রেমের দহনে। নীরোর বাঁশির সুরে আর্তনাদ করেছিল মানবতা, রুমীর বাঁশিতে শোনা গেছে বিশ্ব আত্মার ক্রন্দন ধ্বনি। রুমীর বাঁশি মূল বাঁশঝাড় থেকে বিচ্ছেদের জ্বালায় অন্তর্দহনে নিজের বুকো সৃষ্টি করেছিল ছয় ছয়টা ছিদ্র। সে সব ছিদ্রপথে মূলের সাথে মিলনাকাঙ্ক্ষার আকুতি সুর হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। মানুষের আত্মা ছিল স্বর্গের উদ্যানে, আল্লাহর সান্নিধ্যে। সে আত্মা মাটির দেহের খাঁচায় আবদ্ধ হয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে ধরার ধূলায়। তার একান্ত আকুতি কখন সে ফিরে যাবে অনন্য সে কাননে, পরম প্রেমাম্পদের সন্নিধানে।

রুমীর সে বাঁশির সুর মাতম তুলেছিল পৃথিবীর তাবৎ প্রেমিকের মনে। যুগের পরিবর্তন, কালের হাওয়া আছড়ে পড়া সে চেউকে আটকাতে পারেনি বরং আপন কাঁধে করে সে সুর পৌঁছে দিয়েছে অনাগত মানুষের কানেও। সে সুর বেজেছে রোমে, বাগদাদে, তুরস্কে, দামেস্কে, ইরাকে, ইউরোপে, আমেরিকায়, আকাশের নীচের সকল ভূখণ্ডে। সে সুর বেজেছে লাহোরে আজমীরে। সে চেউ আছড়ে পড়েছে বাংলাদেশের মাইজভাণ্ডারেও।

আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, একথা জেনেছে মানুষ আগেই। কিন্তু তাঁকে পাওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো গতি নেই একথা সাধারণ্যে দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি পেতে সময় লেগেছে অনেক। আল্লাহর মনোনীত নবী রাসূলদের পরে আল্লাহর অলিদের সাধনার পথ ধরে পরম প্রেমাম্পদ আল্লাহকে চিনতে, বুঝতে, তাঁর নৈকট্য হাসিল করতে বেচয়েন হয়েছে মানুষের মন। মনে রাখতে হবে এসব মানুষ কিন্তু গড়পড়তা মানুষ নন। ‘আহসানি তাকবীম’ (সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্ট) তাঁরা, ‘আসফালা সাফেলীন’ (পতনের নিলস্তুরে)

নন। প্রবৃত্তির দাসত্ব তাঁদের ধাতে নেই, তাঁরা স্বহস্তে ধারণ করে আছেন প্রবৃত্তিকে শাসনের মানদণ্ড। আঁধারের আবরণে ঢাকা আত্মসর্বস্ব নন বরং ভুবন-ভোলোনো আলোময় আত্মসর্বস্ব গরীয়ান-মহীয়ান ব্যক্তিত্ব তাঁরা। সুপ্রচুর আত্মশক্তিতে বলীয়ান তাঁরা, আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মান নন। আল্লাহর অভিপ্রায়ের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেই তাঁরা হয়েছেন আত্মগ্লানিমুক্ত, আত্মশক্তিতে বলবান। আল্লাহকে প্রিয় করেই আল্লাহর প্রিয়ভাজন হয়েছেন তাঁরা।

তেমন এক মানুষ ছিলেন বিশ্বঅলি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)। জন্মের পর মাতামহের [কুতবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবাভাণ্ডারী (ক.)] নামের সাথে মিলিয়ে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল সৈয়দ বদিউর রহমান। কিন্তু প্রপিতামহ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) কর্তৃক স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তাঁর নাম রাখা হয় ‘সৈয়দ জিয়াউল হক’। তখনই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর এক নির্দিষ্ট অভিপ্রায়কে বাস্তবায়ন করার জন্যই ছিল সেদিনকার শিশুটির আগমন। জিয়া মানে আলো। হক মানে সত্য। সত্যই তিনি ছিলেন; সত্যের আলো। তাঁর জীবনীকারদের কাছে তিনি আখ্যায়িত হয়েছেন ‘মারাজাল বাহরাইন’ (দু সাগরের মিলনস্থল) রূপে। পিতৃকুলের দিক থেকে তিনি ছিলেন মাইজভাণ্ডারী আধ্যাত্মিক শরাফতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত গাউসুল আযম মাওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)'র প্রপৌত্র এবং মাতৃকুলের দিক থেকে গাউসুল আযম বিল বিরাসত হযরত শাহ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)'র দৌহিত্র। প্রপিতামহ ও মাতামহ দুজনই ছিলেন অপরিমেয় আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী। তাঁদেরই পবিত্র রক্তবাহী মাইজভাণ্ডারী শরাফতের চতুর্থ প্রজন্মের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষ হচ্ছেন হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী। তাঁকে বলা হয় “শাহানশাহ্” ও “বিশ্বঅলি”। চার (৪) সংখ্যার একটি বিশেষ মাহাত্ম্য ও মর্যাদা আছে বিশ্বাসী মানুষের কাছে। সমগ্র বিশ্ব চরাচরসহ দৃশ্য অদৃশ্য সকল বস্তু ও পদার্থ যিনি অস্তিত্বে এনেছেন তিনি হচ্ছেন আল্লাহ্। ‘আল্লাহ্’ বিশ্বপ্রভুর জাতী নাম। এ পবিত্র নামটি চার হরফে গঠিত। সৃষ্টির মধ্যে

সবচেয়ে প্রিয় সৃষ্টি 'আহমদ'। তাও চার অক্ষরের। কুরআনে 'মুহাম্মদ' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে চারবার। কুরআনে 'শরীয়ত' শব্দটিও চার বার এসেছে। কে না জানে প্রধান আসমানী কিতাব চারটি? কুরআন শব্দটিও চার অক্ষরের। কুরআন শুরু হয়েছে 'বিসমিল্লাহ' শরিফ দিয়ে। এতে আল্লাহপাকের যে দুটো ইসমে সিফাত- রহমান ও রহীম- তাও প্রত্যেকটি চার অক্ষরের। ইসমে সিফাতের অধিকাংশ শব্দই চার হরফের। কুরআনের নাযিলকৃত প্রথম শব্দ 'ইকরা'ও চার অক্ষরের। প্রধান ফেরেশতা চার জন। ইসলামী আইনের উৎসও প্রধানত চারটি: কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। সুপ্রসিদ্ধ মাজহাবও চারটি- হানাফি, মালিকি, শাফেয়ী ও হাম্বলী। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহলে বাইত গঠিত হয়েছে চারজন মহান ব্যক্তিত্বকে নিয়ে।

ইসলামের চারটি স্তর। শরীয়ত, তুরীকত, মা'রিফাত, হাকীকত। মানুষের শরীর যেমন চামড়া, গোশত, অস্থি ও মজ্জায় গঠিত। এগুলোর কোনোটিই উপেক্ষণীয় নয়। ইসলামের সূচনালগ্ন হতেই এ চারটি স্তরের চর্চা হয়ে আসছে। শরীয়ত ইসলামী শরাফতের বাহ্যিক রূপ। তুরীকত তার ভেতরের সৌন্দর্য। মা'রিফাত আল্লাহর পরিচয়, হাকীকত সত্যের নির্যাস, উদ্দেশ্য ও বিধেয়। হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: আশ শরীয়াতু আকওয়ালি ওয়াত তরীকাতু আফয়ালী ওয়াল মা'রিফাতু ইরফানী ওয়াল হাকীকাতু আহওয়ালী। অর্থাৎ আমি যা বলেছি তা শরীয়ত, যা করেছি তা তুরীকত এবং যা চিনেছি তা মা'রিফাত, যা প্রত্যক্ষ করেছি তা হাকীকত।

তাসাওউফ উক্ত চারটি স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রম-অভিযাত্রার নাম। মানুষ স্থানুবৎ অজড় পদার্থ নয়। তার মাঝে ফুঁকে দেয়া হয়েছে অপার সম্ভাবনার রূহ। তাই সে অনন্তের পথিক। অনন্তের পানে মানুষের অভিযাত্রা হতে পারে সচেতন কিংবা অসচেতনতার সাথে। তাসাওউফের অনুসারীরা অনন্তের পথে পা ফেলেন অতি সচেতনতার সাথে। কিতাবী জ্ঞানের সাহায্য নেন না তাঁরা। তাঁরা সাহায্য নেন রূহানী চেতনার। স্বীয় মুরশিদের মাধ্যমে তাঁদের অন্তরে এ চেতনার সঞ্চার। এ সাধনাই কুরআনের মূলভেদ, যা রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সিনা-ব-সিনায় সমকাল পর্যন্ত চলে এসেছে এবং সৃষ্টির প্রলয় না ঘটা পর্যন্ত জারি থাকবে।

মানুষের সামগ্রিক জীবনে তাসাওউফ চর্চার উদ্দেশ্য ও শিক্ষা সর্বক্ষেত্রে পরিশুদ্ধতা অর্জন। এ পরিশুদ্ধতা একাধারে শারীরিক ও মানসিক। এ পরিশুদ্ধতা ধারণ করতে হবে কথায় ও কাজে, আচার ও আচরণে, চিন্তা ও চেতনায়, বোধে ও

বুদ্ধিতে। কথায় ও কাজে বিরোধ, আচার ও আচরণে অসঙ্গতি, চিন্তা ও চেতনায় সংঘর্ষ, বোধে ও বুদ্ধিতে দ্বন্দ্ব জাগিয়ে রেখে এ পরিশুদ্ধতা অর্জন করা যায় না। কুরআন আমাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে: কেন তোমরা তা বলো যা তোমরা নিজেরা করো না? মানুষ নিজেকে আপাদমস্তক পরিশুদ্ধ করবে এটাই ফিতরতের দাবি। বিতাড়িত শয়তানের অঙ্গীকার হচ্ছে; সে আদমের সব সন্তানকে পথভ্রষ্ট করবে, শুধুমাত্র আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ছাড়া। তুরীকতের সাধনাই হচ্ছে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হওয়ার সাধনা। তাসাওউফের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ও বলতে গেলে একই।

বিশ্বালি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (ক.) এ সাধন পথের পথিক। আটপৌরে জীবনের সাধারণ ছন্দবিন্যাসকে বিচলিত করে একদিন তিনি বেরিয়ে পড়েন জীবনের বৃহত্তর পরিসরের দিকে। ছিলেন তিনি ডিগ্রি পরীক্ষা দেবার অজুহাতে কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজের ক্ষুদ্র পরিসর হলে। প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র একপাশে ঠেলে বেরিয়ে পড়েন তিনি ভিন্ন ও অভিনব এক প্রশ্নোত্তরের খোঁজে: কে আমি, আমি কার? কোন্ বিন্দু হতে আমার যাত্রা, কোন্ দিগন্তে আমার প্রস্থান? এ যেন এক ক্ষুদ্র শ্রোতধারার মহাসাগর পানে যাত্রা। পেছনে পড়ে রইল সকল পিছুটান। হয়ে রইলেন তিনি প্রকৃতির ছায়াসঙ্গী। জৈবিক সকল প্রয়োজনকে দিলেন বিসর্জন। আলো, মাটি, পানি ও বাতাসের সাথে গড়ে তুললেন সখ্যতা। আলোর প্রখরতা, মাটির সহিষ্ণুতা, পানির শীতলতা ও বাতাসের গতিশীলতা সবকিছু একযোগে আত্মস্থ করলেন নিজের মধ্যে। প্রবেশ করলেন তিনি প্রকৃতির বিশাল ভুবনে, পরিণামে প্রকৃতি হয়ে পড়ল তাঁরই অনুগত। আর কুদরত তাঁকে গ্রহণ করলেন আপন মহিমায়। আটপৌরে জীবনের স্বাভাবিক গতিধারায় অভ্যস্ত সমাজের মানুষ এতদিন যাকে ভেবেছিল উন্মত্ততা, সম্বিত ফিরে এলে তারাই উপলব্ধি করল সেটাই ছিল তাঁর কঠিন কঠোর সুদীর্ঘ রিয়াজত-সাধনা, আল্লাহকে পাওয়ার জীবন-পণ আরাধনা। আমাকে বুঝতে হলে 'কুরআন দেখো' এ-ই ছিল জনসম্মুখে তার ঘোষণা। 'হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ আল্লাহ জিকির কর - সব সমস্যা মিটে যাবে', এ-ই ছিল বিশ্ববাসীর প্রতি তাঁর উপদেশ। এ যেন আধ্যাত্মিক জগতের সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে নিরাপদ বন্দরে ফিরে আসা। এবার যেন স্বজাতির (মানবজাতির) কাছে স্বীয় পরিচয় দেয়ার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। তাই পরম আত্মবিশ্বাসের সাথে ঘোষণা করলেন তিনি, 'রাহমাতুল্লিল আলামীন রসূলের রহমতের সীমানা জুড়ে আমার বেলায়তী কর্মক্ষমতা'। এ

ঘোষণার মাধ্যমে তিনি নিজেকে মানুষের কাছে উপস্থিত করেছেন ‘বিশ্বঅলি’ রূপে। আর রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্বনবী। তিনি রাহ্মাতুল্লিল আলামীন। জগৎসমূহের জন্য রহমত। এ ঘোষণা দিয়েছেন স্বয়ং মহান রব্বুল আলামীন। আল্লাহর রবুবীয়তের সীমানা জুড়ে রাসূলের রহমতের বিস্তৃতি। রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন আল্লাহর অভিপ্রায়ের পুরোপুরি অনুগামী। আর রাসূলের অনুগামী হয়ে হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (ক.) হয়েছেন বিশ্ব বেলায়তের সিপাহসালার। এভাবে মহান আল্লাহর অভিপ্রায়, রাসূলের আনুগত্য ও বিশ্বঅলির বেলায়তি কর্মধারা একবিন্দুতে এসে স্থির ও নিবিড় হয়ে গেছে। পবিত্র কুরআন তাই মানবজাতির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, ‘তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলিল আমর তাদের’। উলিল আমর তাঁরা, যাঁরা আল্লাহর আনুগত্যে ও রাসূলের আনুগত্যে কায়মনোবাক্যে শর্তহীন ভাবে সমর্পিত।

মানুষ কিভাবে এ আনুগত্য করবে? অবশ্যই আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মেনে নিয়ে তাঁর ইবাদত করে। তার সাথে আর কাউকে ইবাদতে শরীক না করে। আর তা করতে হবে রাসূলের দেখানো পথে। অলিদের কাজ হচ্ছে নবুয়তী ধারার শিক্ষাকে বেলায়তি ধারা প্রবাহে জীবন জগৎ ও জগতবাসীদের মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে জারি রাখা। এ এক গুরু দায়িত্ব।

মানুষের জীবন বস্তুত দায়িত্বশীলতার অপর নাম। পৃথিবীতে জীবনযাপন মানে এক ধরনের রাখালিপনার আনজাম দেয়া। প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ অধীনস্তদের বিষয়ে দায়িত্বশীল। এ বিষয়ে তারা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। পৃথিবীতে যার ক্ষমতার বিস্তৃতি যত বেশি তার জবাবদিহিতার সীমানাও তত বড়। মানুষের ক্ষমতাকে অবশ্যই প্রতিনিধিত্বমূলক হতে হবে। প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষমতা মাত্রই কল্যাণমূলক। এর বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করে নিপীড়নমূলক ক্ষমতা। এ ক্ষমতা দাপটশালী। দাপটের পরিণাম দুনিয়াতে পতন ও আখিরাতে অনন্ত দুর্দশা।

দুনিয়ায় পতন ও আখিরাতে দুর্দশা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। আল্লাহ কল্যাণময়, কল্যাণের স্রষ্টা তিনি। সৃষ্টির তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ অভিভাবক। তাঁর অভিভাবকত্বের ফলিত রূপ হচ্ছে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা। নবী রাসূলদের পর অলিরাই হচ্ছেন দুনিয়াতে মানুষের জন্য আলোর পথের দিশারী। তাঁরা

মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান করেন। তাঁরা আল্লাহকে ভালোবাসার পাশাপাশি আল্লাহর সৃষ্টিকেও ভালোবাসেন। কারণ গোটা সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সে-ই বেশি উত্তম যে আল্লাহর সৃষ্টির সর্বাধিক কল্যাণকারী। মানুষের দায়িত্ব তাই মোটা দাগে দ্বিবিধ। আল্লাহর প্রতি কর্তব্য আর আল্লাহর বান্দা তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব। ইসলামের পরিভাষায় প্রথমটি ‘হক্কুল্লাহ’ দ্বিতীয়টি ‘হক্কুল ইবাদ’। আল্লাহর হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তাই আল্লাহর অভিপ্রায়ের কাছে মানুষকে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। আর মুক্তির জন্য ভরসা করতে বলা হয়েছে আল্লাহর রহমতের ওপর। মানুষের যে কোনো স্বল্পনের পর তওবার সুযোগ অব্যাহত। আল্লাহ চাইলে যে কোনো অনুতপ্ত বান্দাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কারণ তিনি রহমানুর রহীম, গফুরুর রহীম, গফুরুল ওয়াদুদ।

কিন্তু ইসলামে হক্কুল ইবাদ তথা বান্দার হকের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের পক্ষে বান্দার হককে এড়িয়ে চলার কোনো সুযোগ নেই। মানুষের জীবন যুথচারী জীবন। যুথচারী জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, ‘সে-ই উত্তম মুসলমান যার হাত ও জিহ্বা থেকে তার প্রতিবেশি নিরাপদ থাকে’। ‘সে আমার উম্মত নয় যে পেট পুরে খায় আর তার প্রতিবেশি উপোস থাকে’ বলেছেন মানবতার নবী রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রতিবেশির হক সম্পর্কে হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম এতো তাগিদ দিয়েছিলেন যে, রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মনে হয়েছিল, প্রতিবেশিদের বুঝি তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে।

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা’য়ালা তাঁর পাক কালামের সূরা মাউনে (সূরা: ১০৭) ঐ ব্যক্তিকে ধ্বিনের অস্বীকারকারী বলেছেন যে এতিমকে গলাধাক্কা দেয় এবং মিসকীনকে অন্ন প্রদানে উৎসাহিত করে না। একই সূরায় ঐ সমস্ত নামাযীর জন্য দুর্ভোগের ঘোষণা এসেছে, যারা নামাযের বিষয়ে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ে এবং সংসারে নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, ছোটখাট জিনিস, তৈজসপত্র ইত্যাদি অন্যকে দিতে অনীহা প্রকাশ করে।

হক্কুল ইবাদের হকদারদের মধ্যে মা-বাবা, ভাইবোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশি, শিক্ষক, ছাত্র, অগ্রজ অনুজ, ফকির, মিসকীন, বেকার, কর্মক্ষম, প্রতিবন্ধী, এতিম, বিধবা, পীড়িত-নিপীড়িত, সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু, মুসাফির, সফর সঙ্গী,

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, বিনা অপরাধে বন্দী, জীব-জানোয়ার, পশুপাখি, কীট পতঙ্গ, নদীনালা, গাছপালা, সমগ্র প্রকৃতি, গোটা মানবগোষ্ঠী অন্তর্ভুক্ত। সম্পদশালীদের সম্পদে নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে। রোজ হাশরের ময়দানে মহাপ্রভু রাব্বুল আলামীন বান্দাদের জিজ্ঞেস করবেন, 'হে বান্দা, আমি তোমার কাছে ক্ষুধার্ত হয়ে অনু চেয়েছিলাম, তুমি তা আমাকে দাওনি, বস্ত্রের অভাবে পরিধানের কাপড় চেয়েছিলাম, তুমি তা দাওনি, পিপাসার্ত হয়ে পানি চেয়েছিলাম, আমাকে তুমি পানি দাওনি, রোগগ্রস্ত হয়ে সেবা চেয়েছিলাম আমার সেবা করনি'। মানুষ অবাক হবে শুনে। আল্লাহ্ অভাবহীন, সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে তিনি, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী, কারো মুখাপেক্ষী নন তিনি। তখন আল্লাহ্ মানুষের বিশ্বয়বোধকে বিদূরিত করে বলবেন, দুনিয়াতে তাঁর অনেক বান্দা ক্ষুধিত হয়ে, বস্ত্রহীন হয়ে, পিপাসার্ত হয়ে, রোগগ্রস্ত হয়ে সাহায্য প্রার্থী হয়েছিল সক্ষম শক্তিশালীদের কাছে অথচ তাদেরকে কোনো সাহায্য করা হয়নি।

এ প্রসঙ্গে আমরা ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রা.)-এর খিলাফত আমলে তাঁর একটি স্মরণীয় উক্তি উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছিলেন: 'ফোরাত নদীর তীরে একটি কুকুরও যদি না খেয়ে মারা যায় তার জন্য ওমরকেই দায়ী হতে হবে'।

মানুষের মৌলিক পাঁচটি অধিকার অনু, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বাসস্থান এর ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষমতাস্বত্ব মানুষের মন ও মগজে, কলম ও কাগজে এ কথাটি গ্রথিত করে রাখা উচিত।

হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর বেলায়তি হায়াতে মানুষকে আল্লাহ্ মুখী জীবনযাপনের পাশাপাশি হক্কুল ইবাদের প্রতি সচেতন করেছেন। নিজে তিনি কত মানুষকে সাহায্য করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের প্রতি তাঁর সাহায্য ও সহযোগিতা ছিল একাধারে বস্ত্রগত ও অবস্ত্রগত। তিনি একদিকে মানুষের মনোজগতে আলোর প্রদীপ জ্বালিয়েছেন অন্যদিকে তাদের পার্থিব প্রয়োজনে মেটাতে বস্ত্রগত সাহায্য করেছেন। তিনি মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশের মালিকের দিকে তাকিয়েছেন, আকাশে অবস্থান করে মাটির দিকে তাকিয়েছেন। অবোধ পশুর প্রতিও তাঁর মমতা ছিল সন্তানের প্রতি মায়ের স্নেহের মতো। হক্কুল ইবাদের গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বারবার হজ্জ পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে হজ্জের টাকায় নিজ প্রতিবেশির অভাব মোচন ও বিবাহযোগ্যা মেয়েদের বিয়ের আয়োজন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

বিরোধীয় জমিনে অবস্থান করে বিবাদমান দু'পক্ষকে সমঝোতায় পৌঁছতে সাহায্য করেছেন। বিত্তবান মানুষের ভুল ধারণাকে অপনোদন করার জন্য টাকার বাস্তিলকে গাড়ি থেকে রাস্তায় ছুড়ে মেরেছেন। তিনি মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছেন জমি কিংবা সম্পদের মালিক মানুষ নয়, সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্, মানুষ আমানতদার মাত্র। আমানতের হকদারকে আমানত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই মানুষের জীবনের সামগ্রিক সাফল্য ও সার্থকতা।

শাহানশাহ্! বিশ্বঅলি!

তাঁর উদারতা মহানুভবতার কথা কে না জানে। সেদিন তিনি কল্পবাজার থেকে চট্টগ্রাম ফিরছিলেন। পথে এক অবাক করা কাণ্ড ঘটল সে কী! গরিব এক মাছ বিক্রেতা রাস্তার পাশে অল্প কিছু মাছ নিয়ে বসে আছেন। শাহানশাহ্ গাড়ি আমিরাবাদ পৌঁছেছে মাত্র। ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন, গাড়ি থামাও। তিনি মাছ বিক্রেতাকে বললেন, ব্যাগে মুড়িয়ে সবগুলো মাছ দিতে। শাহানশাহ্ আউলিয়া! নগদ ত্রিশ হাজার টাকা মাছ বিক্রেতার হাতে দিলেন। তাকে তিনি বললেন, তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে। মাছ বিক্রেতা- এ যেন তার জন্যে আলাদিনের চেরাগ। মেয়ের বিয়ের টাকা যোগাড় হয়ে গিয়েছে। কে সে মহামানব! যার সাথে কোন জানাশোনা নেই! এসেই মাত্র টাকা দিলেন। হারিয়ে ফেলেছিলেন বোধশক্তি, হারাতে ফেলেছিলেন আল্লাহ্তে বিশ্বাস। মনে হয়েছিলো বনি ইসরাঈলের কোন গল্প। এ বুঝি কোন আসমানী ফেরেশতা! তা না হলে সে আবার কী? এতো অল্প মাছ নিয়ে কেউ আবার ত্রিশ হাজার টাকা দেয় নাকি!

শাহানশাহ্! উজির নাযির থেকে মাছ ব্যবসায়ী কামার কুমার জেলে তাতী কেউ বাদ পড়েনি তাঁর দয়ার নজর থেকে। হতভম্ব মাছ বিক্রেতা কিছুটা পরে সম্বিত ফিরে পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন- আল্লাহ্ আছেন! আল্লাহ্ আছেন!! বলতে বলতে বাড়ির দিকে দৌড়াতে থাকেন। মানুষ! কেউ অভাবে আর কেউ স্বভাবে আল্লাহ্কে ভুলে যায়। মাছ বিক্রেতা রাব্বুল আলামিনকে ভুলতে বসেছিলেন দারিদ্র্যের কষাঘাতে। শাহানশাহ্! তাঁর সব কর্মেই আল্লাহ্কে স্মরণ করার তাগিদ থাকে।

তাঁরই বাণী: 'হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর- সব সমস্যা মিটে যাবে'।

তাঁর শিক্ষার সারাৎসার হচ্ছে: তুমি মালিকের হয়ে যাও, মালিক হয়ে যাবেন তোমার। ফাজকুরুনি আজকুরকুম।

মা'জান, উম্মুল আশেকীন এ ওয়াই এমডি জাফর

মা, মা'জান।

একজন সন্তানের পক্ষে মা'কে নিয়ে লেখা যে কত কঠিন, কত যাতনার তা এ লেখা যদি লিখতে না হতো তা হলে এত গভীরভাবে আমাকে ভাবাতো না, নাড়াও হয়তো দিত না। মা'কে দেখেছি, মা'কে জেনেছি কিন্তু অনুভূতিকে জাগ্রত করে দেখার, রূপপরিগ্রহ করার শক্তি রোখে দেখার অন্তর্গর্ভিত রূপকে পরিগ্রহ করে অপরূপ মাধুর্যে বিকশিত করতে পারে – সে দেখার শক্তিও যে অনুপস্থিত আমার মাঝে, তা ভাবিনি আগে। তবুও চেষ্টায় যদি মা'য়ের কিছু ছাপ ফেলতে পারি, তা'ই আমার জীবনের আরেকটি প্রাপ্তিযোগ বলে ভাববো।

তখন বয়স কত আন্দাজ করতে পারছি না। পরিষ্কার চোখে ভাসছে একটি কবরস্থান। বাইরে অনেক লোক, ভেতরে কবরের পাশে ক'জন দাঁড়িয়ে। কবরস্থানের গেটের ৪/৫ হাত উত্তর-পশ্চিমে দেয়ালের ২/৩ হাত পূর্বের কবরটির পাশে ফ্রক পরা ছোট্ট একজন আমাকে নিয়ে দাঁড়াতে-কবরের পাশে সবাই কান্না দমন করে ফোঁফাতে লাগলো আর ফ্রকপরা জন আমাকে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে আমার ডান হাতটি কবরে শায়িত লাশটির দিকে ইশারা করে কী যেন বলছেন আর ফ্রকের হাতা দিয়ে চোখ মুছছেন। তখন বয়স ২/৩ হবার সম্ভাবনা বেশি।

তারপর ক'বছর পরের ঘটনা। পেছনে ছায়া ঢাকা পাখি ডাকা শীতল নিস্তরঙ্গ একটি পুকুর, চুপচাপ অন্দরমহল, সন্তর্পণ চলাফেরা। একটা গুরুগম্ভীর আব্বা শব্দ। বহির্বাড়ির ইজি চেয়ারে অর্ধশায়িত শুভ্র চুল-দাড়ি, ভারী চশমা, মোটা সফেদ কাপড়ের পাজামা, হাতকাটা ফতুয়ার এক মহান পুরুষ, সামনে উপবিষ্ট আশেক-ভক্তজন। আর সামনে বিশাল এক পুকুর। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় দোচালা টিনের ছাউনি ঘর। ভেতরে সুন্দর চাদর আবৃত একটি কবর। চারদিকে চৌকোণা ঈষৎ উঁচু কাঠের সুন্দর অর্গল, খাঁজকাটা চারটি খিলানের মধ্যক্ষেমে ঝোলানো ছোট ছোট সোনার চাঁদ, ফুল, বিভিন্ন বাহারি সুতি কাজের মধ্যে জ্বল জ্বল করে শোভা পাচ্ছে চার কোণায় চারটি বর্তুলাকার উজ্জ্বল লাল রঙের কী যেন। দৃষ্টি বার বার সেদিকে হেঁচট খাচ্ছিল, মনে পড়ছিল বার বার মায়ের কাছে শোনা কেছা কাহিনী- পাহাড়ী ঝর্ণার পানিতে ভেসে আসা কী যেন লালের কথা। সাথীদের ডাকে তখনকার

সে জিয়ারত ছেড়ে ভেতর বাড়ি খাবার ঘরের দিকে চলে গেলাম – মা'জান তখন বাড়ির বড় বৌ!

এরপর শঙ্খ-হালদার পানি অনেকদূর গড়িয়েছে। আমিও স্কুল কলেজের পাঠ চুকিয়ে দরবারের অনেক কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকি। কিন্তু দরবারে যাইনা। ধর্ম কর্ম না করা কেমন গর্বের হয়ে দাঁড়ায়। দরবার নিয়ে হালকা কথা বলতেও মুখে আটকায় না। কলেজ জীবনে '৬৬/৬৭ থেকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়ে যায়। তাই কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় ভাইয়ের সাথে সক্রিয়ভাবে যেমন কাজ করেছি, কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে মুক্তিযুদ্ধের পর শিক্ষক হিসেবে সেই কলেজেই যোগদান করি এবং '৭৩ সালে এ্যাডহক ভিত্তিতে সরকারী কলেজে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসার পরও গ্রহণ করিনি। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এরকম প্রকট ছিল – মুক্তিযুদ্ধের পর প্রতিটি তরুণের কাছে।

এ অবস্থায় একদিন বাবাজানের বড় জামাতার চৈতন্যগলির বাসায় গেলে মা'জান এবং বড় জামাতার আন্মা আমাকে বাবাজানকে সালাম করতে পাঠান তাঁদের বৈঠক ঘরে। সালাম শেষ করে নিজের নাম বলতেই – তিনিই বলা শুরু করলেন- জ্বী, আপনি প্রফেসর, সাতকানিয়ার উকিল আলী আহমদ মিয়ার ছেলে (তিনি আব্বার নাম সেভাবে বলতেন)। এ অবস্থায় আমাদের বাড়ি যেতে অনুরোধ করলে – তিনি শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন – যেন হাজার বছর ধরে তিনি আমার এ অনুরোধের অপেক্ষায় ছিলেন। সেদিন মা'জানসহ দু বোন যদি আমাকে এ বোধ জাগিয়ে না দিতেন, হয়তো আমি যেই তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই থাকতাম। বাবাজান মেহেরবানী করে তার পরের দিনই আমাদের বাড়ি তশ্রিফ রাখেন এবং আমার আব্বাজানের কবর জিয়ারত করে তাঁকে দয়ার দানে কৃতার্থ করেন। তারপর থেকে তিনি আমাদের বাড়ি তশ্রিফ রাখেন অনেকবার মেহেরবানী করে – কোনবার মা'জানসহ সবাইকে নিয়ে। বার বার বলেছেন দরবারে যেতে। দরবারের সাথে তায়াল্লোক রাখতে – এরপর থেকেই আমার পরিবর্তন।

'৭৪ সালে বাবাজানকে হাসান বাগ/হক মন্জিলে পাঠানোর পূর্বে মাইজভাগুরীয়া তুরিকার স্বরূপ উন্মোচক, খাদেমুল

ফোকুৱা দাদাজান কেবলা আলম দু কামরার একটা দালান গড়ে পাঠিয়েছিলেন। শুধু সে দুটো কামরা নয়, আরো ঘর যে বাবাজানের প্রয়োজন! তাই মা'জানের আশ্রয় হলো সবাইকে নিয়ে ফাঁক ফোকর ওয়ালা সাধারণ বেড়ার ১৪/১৫ হাতের শণের ছাউনির ঘরে- মূলতঃ পাকের ঘরে। আর সেই ঘরে বর্ষার প্রচণ্ড ঝড়ের দাপট, বৃষ্টির ছাট, চৈত্রের গুমোট হাওয়া, মাঘ রাতের কনকনে বাতাসে মা'জানের ঘর সংসার - জীবন যাপন, সবার বেড়ে ওঠা। এ কী পরীক্ষা, প্রশিক্ষণ, না ত্যাগ তিতিক্ষার প্রত্যক্ষ রূপায়ন, না ধাপ পেরোনোর সরল পাঠ জীবন গুরু, না সংসার সাজানোর উন্মুক্ত বাসনার ভিন্ন রূপের বয়ান, না ঐশী আলোয় পোড়ানো ঝল্কানি।

বাবাজান আমাদের বাড়ি প্রথম তশ্রিফ রাখার দিন থেকে আমার ভেতরে বাবাজানকে দেখার, দরবারে যাওয়ার একটা তাগাদা প্রায়ই অনুভব করতাম। তা'ই সুযোগ পেলেই দরবারে চলে যেতাম আমার গ্রামের বাড়ি বাঁশখালীর কালিপুর থেকে। '৭৫ সালের কোন একদিন - একবার দরবারে পৌঁছে দেখি বাবাজান জজব্ব হালে- সবাইকে চলে যেতে বলছেন- গেটের বাইরে যেতে বলছেন। হঠাৎ সবার মাঝে আমার দিকে দয়ার দৃষ্টি পড়তেই পরম দয়ালু কণ্ঠে বললেন, 'আপনি ভিতর বাড়ি যান, আপনি যেতে পারবেন'। যতটুকু মনে পড়ে সেই থেকে আমার ভেতর বাড়ি যাওয়ার অনুমতিটা কেমন পাকা হয়ে যায়।

আমিও উরস শরিফ, ফাতেহা শরিফ বা কোন অনুষ্ঠান না থাকলে দরবারে গিয়ে জিয়ারত শেষে ভেতর বাড়ি চলে যেতাম। মা'জান কেমন আমাকে দেখলে খুশি হতেন। পুরনো দিনের সে সব কথা তুলতেন। কথা বলতে বলতে প্রগলভ উচ্ছ্বাসে অনেক দূরে চলে যেতেন। একদিন শিশুর মতো হাসতে হাসতে বললেন- জানো জাফর! তুমি ছোট বেলায় খুবই অসুস্থ ছিলে, সারা শরীর ছিল ঘা'য়ে ভরা। সারাদিন কাঁদতে, শুধু শুধু কাঁদতে - আর আমি তোমাকে শান্ত করার জন্য তোমার ঘায়ের শুকনো অংশ চুলকিয়ে দিলে - তোমার কান্না থামতো, আর ঘুমিয়েও পড়তে আমার কোলে।

চট্টগ্রামের আঞ্চলিক নাস্তার মধ্যে মধুভাত আমার বেশি পছন্দের তা মা'জান জানতেন বলে অনেক সময় নিজের হাতে এনে আমাকে খেতে দিতেন, কখনো ফ্রীজ থেকে এনে দিতে বলতেন। কখনো স্পঞ্জ মিষ্টি/রসগোল্লা খেতে দিতেন বা আমের মৌসুমে পাকা আম পোড়া মরিচ মেখে দিতে বলতেন আমার জন্য - বলতেন খাও - তোমার জন্য কড়া করে রং চা দেবে - ডায়বেটিসের অসুবিধা হবে না।

মা'জানের মনের মধ্যে একটা দুঃখ ছিল - বাবাজান আমাদের বাড়িতে কম যান। তিনি জানেন বাবাজান যেখানে যান, যে জায়গায় যান তা উজ্জ্বল হয়ে যায় সর্বতোভাবে। আল্লাহর রহমত বাবাজানের দয়ায় মা'জানের নেক নজর আমাদের গোটা বাড়িতেই যে বহমান এখন।

আরেকবার জিয়ারত সেরে ভেতর বাড়ির দরজায় পৌঁছতেই মা'জানকে দেখলাম অনেকটা রাগতঃ অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন- তোমরা যে মাইজভাগুরী গানের ক্যাসেট বের করেছ তাতে একটি ভাগুরী গানকে চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানের সুরে গেয়েছ কেন? তখন উনাকে বলার মতো আমার কিছু ছিল না। বার বার নিচু হয়ে মাফ চাচ্ছিলাম এবং ভবিষ্যতে ভুল না করার ওয়াদা করছিলাম। এবার একটু হেসে বললেন মাইজভাগুরী গানের আদি সুরটা ধারণ করে নিয়ো - মনে রাখবে, সবাইকে বলবে -

আরেকবার বাবাজানের ওফাতের পর কোন এক উরস শরিফের পরের দিন ভিতর বাড়ি আমরা ক'জন গেলে আমাদের মধ্যে এন্তেজামের একজন বলে উঠলেন মাধু এবার আমাদের এখানে হাদিয়া বড় বাড়ি থেকে বেশি হয়েছে। শুনেই মা'জান অসম্ভব রেগে বললেন- 'হাদিয়া কী? হাদিয়া বুঝ? আমার শ্বশুর বাড়ির সাথে কখনো কিছু তুলনা করবেনা, কখনো না'।

আরেক উরস শরিফের পূর্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সভা শেষে মওলা হুজুরকে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সভাপতি ভাই জসিম, কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র ক'জন সদস্যসহ হুজুরা শরিফে যাই। সেখানে এন্তেজাম পরিচালনা ও বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বক্তব্য উপস্থাপিত হওয়ায় সিদ্ধান্ত পেতে সময় লাগে। প্রায় সাড়ে চারটার পর মওলা হুজুর ভিতর বাড়ির ডাইনিংয়ে দাঁড়াতেই - এতক্ষণ অপেক্ষারত মা'জান জিজ্ঞেস করলেন - তোমার এত দেরি হল কিসে? জী মা, ওখানে কয়েকজন বিভিন্ন অসুবিধার কথা বলছিলেন, তা শুনে সিদ্ধান্ত দিতে একটু দেরি হলো। শুনে মা'জান ব্যথিত উন্মায় বললেন- ভক্ত তো তারাই- দরবার যখন যা বলবেন যেভাবে যা দেবেন, তা নীরবে মাথা পেতে খুশি হয়ে গ্রহণ করবে - আমার শ্বশুরের ওখানেতো এ সব শুনিনি। এবার মওলা হুজুর বললেন জী মা আমি উনাদের সব আবদার মেনে নেবো কিন্তু উনাদেরকেও আমি সেভাবে শক্ত হাতে গড়ে নেবো। এ কথা শুনে ভাই জসিম ও আমি একে অপরের দিকে দেখছিলাম এবং বের হয়েই তা সিকদার সাহেবকে জানালাম।

সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে বড় হওয়া বড় বাড়ির আদরের

দুলালী কনিষ্ঠ কন্যা - যেন তিল তিল করে নিজেকে তৈয়ার করেছেন ঐশী আলোর বলকানিতে ঝংকৃত, ঐশী প্রভায় প্রভাবিত, পরম প্রভু স্রষ্টার রূপে রূপায়িত আলোকময় বাড়ির আলোকোজ্জ্বল মহাপুরুষের পবিত্র জীবন সাথী হয়ে নিজেকে বরিত করতে। যার কারণে ভিন্ন পরিবেশ ভিন্ন আবহের হয়েও একদিনে গড়া মন-মানসিকতা-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-প্রয়াস, ধী-শক্তির জোরে হয়ে উঠেন সার্থক বড় বৌ। গভীর শ্রদ্ধা, ঐকান্তিকতা ও ত্যাগের মহিমায় পরম শ্রদ্ধেয় শঙ্কর-শাশুড়ির কাছে হয়ে উঠেন একান্ত স্নেহভাজন, দেবর-ননদের কাছে শ্রদ্ধাভাজন, আর জা'দের কাছে হয়ে উঠেন ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল পরীক্ষিত প্রিয়ভাজন। স্নেহভাজন, প্রিয়ভাজন, শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেন মামা-শঙ্কর বাড়ির সবার কাছে। এমনকি পাড়া-প্রতিবেশির দুঃখ-বেদনার সাথী হয়ে।

উচাটন মন, ত্রস্ত ক্ষণ, শঙ্কিত জীবন - রাত কাটে দিন ফোটে দিন চলে রাতের মায়ায় - এভাবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, মাস, বছর কেটে যায়। কখনো মাঘ-শীতে পেছন পুকুরের গলা ডোবানো কনকনে জল থেকে উঠে বলেন- আজ বেশি ঠাণ্ডা, কেউ কি এক কাপ চা দেবেন? কখনো রাত দু'টোয় খাদেমা আশাকে ডাকেন- মাধু, আমাকে দু'টো ভাত দেবেন, খুব ক্ষুধা, বা কখনো ভোর রাতে উঠে ডাকেন- জেবুর মা, আমাকে এক কাপ চা দেবেন? দু'টো বিস্কিট -। কখনো একনাগাড়ে ১৮ দিন দরজায় খিল দেয়া, মাঝে মাঝে পায়ের শব্দ, বাথরুমে পানির আওয়াজ, কখনো দরাজ কণ্ঠের গান- এই যে দুনিয়া কিসের লাগিয়া এত যত্নে গড়াইয়াছেন সাঁই। শান্তি তবুও ঘরে আছেন। কিন্তু যখন দিনের পর দিন ৫১৫২ গাড়িতে, ইব্রাহীম মিয়ার জীপে বা ট্যাক্সিতে ৫, ৭, ১০, ১২ দিন ঘরের বাইরে কোন খবর নেই, তখন? গভীর রাত, ভোররাত বা ফযর, জজব হাল-একটা গাড়ির তীব্র হর্ন কোনমতে গেট খুলে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে - কখনো বা জেবুর মা মাধুকে বলেন- এক কাপ চা খাবেন - সমস্ত উৎকর্ষা উচাটন অবস্থার অবসান, আনন্দে পুরো বাড়ি যেন মাতোয়ারা।

আলাপচারিতা, কথা বলার মিষ্টতা, স্বভাবের নমনীয়তা আদর-আপ্যায়নের আন্তরিকতা, সর্বোপরি ব্যবহারে সহনশীল নিঃখাদ ভালোবাসা- খাদেমা মহিলা, আত্মীয়, অনাত্মীয়, মেহমান, জায়েরীন, দরবারী কর্মী, পরিবার সবার জন্য সমান। সবার প্রতি নজর, সবাইকে দূর থেকে দেখভাল করা যেন তাঁর মূল দায়িত্ব-মূল কাজ। কেউ যেন ব্যথা বা কষ্ট নিয়ে ফিরে না যায়, সবাই যেন দরবার থেকে পূর্ণতা নিয়ে

যায়, দরবারের কোন কিছুই যেন মা'জানের অগোচরে নয়। জামাল আহমদ সিকদার মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক, তখন চোখে দেখেন না। কার সাথে কী মতানৈক্য হওয়ায় অস্বিজেনের কাছে বাসা নিয়ে চলে গেছেন। মা'জানের কাছে এই খবর পৌঁছলে তিনি মওলা হুজুরের সাথে আলাপ করে ওনাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে পাঠান। উনি শেষ পর্যন্ত বললেন, চলতে ফিরতে তার একজন লোক লাগে - উত্তরে দরবার থেকে যখন বলা হলো, ওনার যে লোক লাগে তা দরবার জানেন। সেই থেকে আমৃত্যু তিনি দরবারে ছিলেন এবং সেখানেই তিনি ইন্তিকাল করেন। পোর্টের ইঞ্জিনিয়ার আলী নবী চৌধুরী বাবাজানের বড় আশেক। তিনি কী কারণে যেন দরবারে আসা বন্ধ করে দিলে মা'জানের নির্দেশে আমি তার সাক্ষাতে গিয়ে মা'জানের কথা বলি। একই ঘটনা বাগদাদ ফার্নিচারের আবদুশ্ শুকুর সাহেবের বেলায় - সেখানেও তিনি আমাকে পাঠান। পরে দু'জন নিজেদের ভুল শোধরিয়ে আমৃত্যু দরবারের খেদমতে ছিলেন। ইনিই মা'জান - লক্ষ ভক্তের মা'জান - উম্মুল আশেকীন। পরশ পাথরের আসোকীত মাকে একবার বেদনায় বলেছিলাম- মাধু, অনেক ভক্তজন বড় বড় হাদীয়া আনেন, আমরা সারা বছর ছোট একটা হাদীয়া দিই। উত্তরে তিনি হাসলেন- কোনদিন মন খারাপ করবেনা। তোমরা যা করছো তা হাদীয়ার চাইতে কোটি কোটি গুণ বড় মনে রাখবে।

তাই তো আমাদের মতো লোকের সম্পৃক্ত মাধু- তাই যেন আমাদের নাজাতের উসিলা হয় দরবারের খেদমতে যেন জীবনপাত করতে পারি।

সূফি উদ্ধৃতি

“আমি সাতশত আলেমকে জিজ্ঞেস করেছি, বুদ্ধিমান কে? ধনী কে? জ্ঞানী কে? দরবেশ কে? এবং কৃপণ কে? উক্ত সাতশত আলেম সকলেই জবাব দিচ্ছেন যে, যে ব্যক্তিকে দুনিয়া ধোঁকা দিতে পারে না, সে জ্ঞানী। আল্লাহর বিধান ও বন্টনের উপর যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট, সে ধনী। যার অন্তরে বেশির জন্যে আকাঙ্ক্ষা নাই, সে দরবেশ। আর যে ব্যক্তি খোদার দেওয়া মাল-দৌলতকে খোদার বান্দাদের চেয়ে অধিক প্রিয় মনে করে, সে ব্যক্তি কৃপণ”। - হযরত শাকীক বলখী (রহ.)

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)'র মর্যাদা এবং অবস্থান প্রসঙ্গে

আলোকধারা ডেস্ক

“মহা বিশ্বের সব কিছুর একক মালিক আল্লাহ্। তা জানার পরও (হে বিশ্বাসীগণ,) তোমরা আল্লাহ্র পথে মুক্ত হস্তে ব্যয় করো না? তোমাদের মধ্যে যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে ও সংগ্রাম করেছে তারা এবং পরবর্তীরা সমান নয়। যারা মক্কা বিজয়ের পরে আল্লাহ্র পথে ব্যয় ও সংগ্রামে অংশ নিয়েছে, তাদের চেয়ে পূর্ববর্তীরা মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। তবে আল্লাহ্র পথে যারা ব্যয় ও সংগ্রাম করে, তাদের সবার জন্যেই আল্লাহ্ কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা ভালো করেই জানেন” (সূরা-হাদীদ: ১০)। উপর্যুক্ত আয়াতে করীমায় মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করা হয়েছে। আয়াতের মর্মানুযায়ী এটি সুস্পষ্ট যে, সাহাবায়ে কেরাম নিঃসন্দেহে অবশিষ্ট উম্মত থেকে স্বতন্ত্র। এই আয়াতের নির্দেশনা অনুসারে সুস্পষ্টভাবে বলা যায় ঈমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশতঃ সওয়াবেও পার্থক্য হবে।

পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন সূরায় সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত একটি বিন্যাস পাওয়া যায়। আল কুরআনের নির্যাস হিসেবে এর বিন্যাস ও পরিচিতি আমরা এভাবে চিহ্নিত করতে পারি—

১. আহলে বাইতে রাসুল (দ.) তথা পাক পঞ্জতন, তাঁদের সঙ্গে অন্য কারো তুলনা করার বিষয়ে বিশ্বনবী (দ.) নিষেধ করেছেন। হযরত ফাতিমা (রা.)'র জীবদ্দশায় হযরত আলী (ক.)-কে অন্য কোন মহিলার পাণি গ্রহণে সুস্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে।
২. উম্মুল মুমিনীনগণ। তাঁদের মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.)'র জীবদ্দশায় হুজুর (দ.) অন্য কাউকে শাদী করেননি। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) ছিলেন একমাত্র কুমারী এবং তাঁর হুজুরা শরীফে রওজায়ে আকদস অবস্থিত। উম্মুল মুমিনীনগণের জন্য বিশ্বনবী (দ.)'র বেসালের পর অন্য কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এটি উম্মুল মুমিনীনগণের স্বতন্ত্র সম্মান ও মর্যাদার পরিচয় নির্দেশক বিষয়। তাঁরা অন্য সকল মহিলা থেকে সম্মান ও মর্যাদায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।
৩. আশ্রায়ে মোবাম্বা-দশজন সাহাবি, যারা দুনিয়ায় অবস্থানকালে বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। উল্লেখ্য যে, তাঁদের মধ্যে দু'জন খোলাফায়ে রাশেদীনের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রা.) মসজিদে নববীতে অবস্থিত পবিত্র রওজায়ে আকদসে হুজুর (দ.)'র পাশে পবিত্র স্কন্ধের নিম্নভাগে শায়িত হবার বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন।
৪. মক্কা

জীবনে অবস্থানকালে কাফিরদের হস্তে অমানুষিক নির্যাতনে নিপীড়িত সাহাবাবন্দ, মুহাজির এবং আনসার সাহাবাবন্দ, যারা জন্মস্থান ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত করেছেন এবং যারা সম্পদ ব্যয় ও মুহাজিরদেরকে আশ্রয় দিয়ে ইসলাম প্রচারে সর্বাঙ্গিক ভূমিকা রেখেছেন। ৫. আসহাবে সুফফা যারা সর্বক্ষণ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন। তাঁরা বিশ্বনবী (দ.)'র পবিত্র কণ্ঠে নিঃসৃত ওহীর ব্যাখ্যা শুনতেন এবং আত্মিক জগত সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্ত হতেন। জাগতিক কোন চাহিদার সঙ্গে তাঁরা সম্পর্কযুক্ত হতেন না। তাঁরা নির্দেশ পাওয়া মাত্র সর্বত্র জিহাদে शामिल হতেন। ৬. বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাবন্দ, যাদের পূর্বাপর সমস্ত ক্রটি ক্ষমা করা হয়েছে। ৭. সাহাবা কেরামের মধ্যে যারা হিজরত করার সময়ে কাফিরদের চাপে সমস্ত সম্পদ পরিত্যাগ করে মদিনায় ছুটে এসেছিলেন। ৮. মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণকারী সাহাবাবন্দ। ৯. মক্কা বিজয় পরবর্তী সকল ব্যক্তি যারা বিশ্বনবী (দ.)'র সংস্পর্শে ধন্য হয়েছেন। সুতরাং সাহাবাকেরাম সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং নতুন বিশ্লেষণের মাধ্যমে মান নির্ণয় প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বলে আমরা মনে করি না। কারণ বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ এবং রাসুল (দ.)'র নিকট সংরক্ষিত। তবে ইতিহাসের আলোচনা পর্যালোচনাসমূহ সাহাবায়ে কেরামের সামাজিক-রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী নির্ভর হওয়ায় এ সম্পর্কিত মূল্যায়নে মূল্যবোধ ভিত্তিক তারতম্য পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। ইতিহাস পার্থিব কর্ম এবং ঘটনাবলির নিরিখে রচিত সুস্পষ্ট দলিল। যেকোন সত্য দলিল রোজ হাশরে অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে ন্যায় বিচারের স্বার্থে উপস্থাপিত হবে। ইতিহাসের ঘটনাবলি সমাজ রূপান্তরের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কজনিত বিষয় এবং ‘সিরাতুল মুস্তাকীম’ নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন কখনো বারিত নয়। কারণ পবিত্র কোরআন আল্লাহ্র আনুগত্য এবং বিশুদ্ধ জীবনাচার অনুশীলনের লক্ষ্যে অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করে বারবার সতর্ক করে দিয়েই সঠিক পথের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ কারণে শঠতা, প্রবঞ্চনা, কপটতা, ভণ্ডামি পরিহারপূর্বক সঠিক পথ চিহ্নিত করার স্বার্থে শালীনতা, বস্তুনিষ্ঠতা এবং আদব-শিষ্টাচার রক্ষা করে উন্মুক্ত আলোচনা কখনো অবজ্ঞা এবং অশোভনীয় হিসেবে বিচার্য নয়।

“تاریخه تاساؤڈفه ইসলাম” ٲرھه تاؤھده آادہیان বিষیک آالوآنا

اھھیے ٲاؤسول آايم ہیرت ماؤلانا شاھ سؤفہ سہیاد دہلاؤر ہوساين ماہجباؤاری (ک.) رآیت ویکھات تاساؤڈف ٲرھھ ‘بہلايۃ مواتلکا’ي تاؤھده آادہیان سمنٲرکے ٲٲیری ٲاؤٲیتيٲرٲ تاتریک ورننا اٲسٹھانن کرا ہئیے۔ تاؤھده آادہیان বিষیک آالوآناي تینی مہشہرہر کایرہو شہرہ اباستھت فوڈاد ویشو ویدیا لہیہر ویشو وہرہٲا اٲھیاٲک ڈ. مہاھامد مہسؤفہا ہہلمی کترک آاروی باھای رآیت اباٲ ٲاکہستھانہر آھاتیمان لہآک رہس آاھمد آاھفاری (۱۹۰۷-۱۹۷۷) کترک اڈر باھای انڈیت تاساؤڈف ایتہاسہر ایت مٲلھابان کیتاا “تاریخه تاساؤڈفه اسلام”ر اڈھتہیؤ اٲسٹھانن کرہہن۔ انوسکھتسؤ ٲاٹکہر آاٹاٹارھہ اڈھ کیتااے ورنیت تاؤھده آادہیان বিষیک آالوآنا ر وٲانواا ٲرکاش کرا ہلہو۔ تھي نیشیتہر لکھي کیتااےر مٲل سکھان کٲیؤ آھٲانہو ہلہو - سمنٲادک۔

توھید اریان

توھید اریان!

یہ بھی منصور حلاج کا ایک نظریہ تھا!!

حلاج کا خیال تھا کہ تمام اریان اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ان کا فروعات میں اختلاف ہے لیکن اصل کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ہی ہے۔ تمام اریان کا مرکز اور منبع خدا ہے۔ تمام اریان خدا کے لیے ہیں، ہر دین سے کوئی نہ کوئی گروہ وابستہ ہے۔ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی بالادست قوت کی مرضی سے جو شخص کسی مذہب کا بطلان کرتا ہے وہ گویا عظم لگاتا ہے کہ فلاں مذہب اس نے خود اختیار کیا، اور یہ بات حلاج کی رائے میں مسلک قدریہ کے ذیل میں آتی ہے اور اس کے نزدیک اس امت کے مجوس جو لوگ کہلا سکتے ہیں، وہ قدریہ ہیں۔

حلاج کا یہ خیال بھی تھا کہ یہودیت اور مسیحیت اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے نام اور القاب جدا جدا ہیں۔ علامات و آثار میں بھی اختلاف اور تغاڑ ہے لیکن جو مقصود اصل ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں، وہ ایک ہی ہے۔

تاؤھده آادہیان

اٲیؤ مনسور ہانلہاؤہر اٲک اٲیؤ ڈھتہبھہ آھل۔ ہانلہاؤہر ڈارٲا آھل ہہ، یاتؤلہو ڈرم آاھہ سہؤلہو ہاکہکتہر دیک ہتہ اٲک۔ شاآاٲت ویشیہ آھننٹا ڈاکلہؤ کھنڈ مٲلہر ساٹھہ ہہ سمنٲرک تا اٲکہی۔ ٲرٲہک ڈرمہر مارکاج (کهنڈ) اباٲ ماہبا (اٲس) ہلہو آھدا۔ یات ڈرم سکلہی آانلہاھر آنہی۔ ٲرٲہک ڈرمہر ماہہ کون نا کون دل ٲوآر رہیے، اٲا نہؤہر اٲھاتہ نہی، وراٲ شآکشالی سٹھار (آانلہاھ) اٲھاتہ۔ کون واکھ کون ماہہباکے واکھل ساہیست کرہہ یادی اٲیؤ لھوم آاری کرہہ ہہ، “اموک ماہہبا سہ نہؤہی اٲھتیار کرہہہ” تہہ اٲرٲ کٹا ہانلہاؤہر ماتہ کداریا ماتہباہر آاؤتای اباٲ نیکٹہ آلہ آاسہ۔ اٲیؤ اٲمٹہر ماتھہ ماؤس ہہ سکل لہاککے ونا ہئی تارا کداریا۔ ہانلہاؤہر اٲیؤ

धारणा छल ये, इहदियत, मसिहियत, इसलाम एवं अन्यान्य धर्मर नाम एवं लकव आलादा आलादा। चिह्नं ओ प्रकृतिर मावोओ भिन्नता एवं दन्द रयेछे। किञ्च मूल लक्ष्य एवं उद्देश्यर मध्ये कौन भिन्नता नै। ता एकै।

एकमात्र आल्लाहूँ यिनि आपन बान्दादेर उपर निजेर इच्छार प्रतिफलन घटान। आर एटा खोदायी भावेइ हय। तिनि आपन बान्दादेर मावोे फायसाला करेन ये, अमुक आदमी इहदि हवे, अमुक नासारा मजहाबेर हवे, अमुक मुसलमानेर घरेर जन्म निवे। ताँ नै ए विषये कारोे मावोे दन्द हওয়া उचित, नै कौन धर्म निये वितणय लिंग हওয়া उचित! केनना सकल धर्म खोदार। एवं ये ब्यक्ति ये धर्मइ ग्रहण करुकर नै केन ताते खोदार सञ्चष्टि एवं इच्छा निहित थारे। विभिन्न धर्मर मावोे ये एखतेलाफ देखा यय एटा मौलिक एवं प्रकृत मतनैक्य नय। वरं ता बाह्यिक मतविरोध। सत्य कथा एइ ये, यत धर्म रयेछे ता नामेर कारणे विभिन्न हयेछे। प्रकृत अर्थे एक। एइ विभिन्नता बाह्यिक, मूल किञ्च एक-इ। येभावे हाकिकते मोहाम्मदीर परम्परा विषये मनसुर हान्नाजेर दृष्टिभङ्गि परवतीते अन्यान्यराओे ग्रहण करेछेन एकइभावे वयाहदातुल आदइयानेर व्यापारेओे मनसुर हान्नाजेर दृष्टिभङ्गि परवती अन्यान्य आकावेरगण समर्थन एवं अनुसरण करेन। येमन महिउदिन इबनुल आरबी, आमर इबनुल फारेद, जालालुदिन रूमि, आदुल करिम जिली एवं अनेक उच्चमार्गीय अजिजत सुफि, पण्डित, उलामा, शायेरगण ताँदेर कविताय, ग्रन्थकारगण ताँदेर ग्रंथे एइ ततुरेर प्रशंसा करेछेन एवं एटाके समर्थन ओ एर वैधता स्वीकार करेछेन। एइ तत्रुटि इसलामेर रुहानी जिन्देगीर

الله کی مشیت

दुसरे الفاظ मल हलाज का मलूब ये तहा के वुध वरुफ الله हे जवापे बन्दुल पर अप्नी मशित ना फड कर्ता हे ओर वुध वरुफ खदा ई हे जवापे बन्दुल के बारे मल फल्लेह कर्ता हे के फला आदी येवुदी हु, फला नरुान्नी म्दहब अख्तियार करे ओर फला मुसलमन के गहर मल पूदा हु लहुदाने कुस पर म्उत्स हु ना चारुे, नै कुस से दीन के बारे मल मनाظرत करुनी चारुे के दीन संब खदा के हेन ओर जू शख्स जू दीन कु अख्तियार कर्ता हे अल मल बेही खदा की मरुضي ओर मशित شامل हुती हे ओर ये जू अखलाफ मखलाफ अदीान मल नलर आता हे ये अल्ली ओर जू हरी अखलाफ नैस हे हे वरुफ अल ओर मलूबर का अखलाफ हे वरुनै ह्की बात ये हे के तमाम

अदीान नाम के अलतार से त्दुद हेन- ह्कित के अलतार से अलक हेन, मुसुनी अलक हे, अलम

जुदा जूदअन- ये म्गार मलूबर अलक ही ह्कित हे हेन-

जू शलर ह्कित म्मुदी के सलसे मल हलाज का नलर ये बुद कु दुसरे लुगुन ने

कुुल क्का असी लर वदत अदीान के म्दले मल बेही मन्सुुर हलाज के नलर ये की ता सैद वतलैद बुद

के दुसरे अकर म्शू म्ही अदीन अलन ऐरुनी, ओर अलरुन الغارुु अलर जلال अदीन रुमी ओर

अदुल करुम। जूलुी ओर दुसरे से सरु आउरे ओर सरु आदु रुुु गारु सुवुुा ओर अलले की-

शुुा ने अप्ने अशुुार मल, ओर म्मखुन ने अप्नी त्स्नलफत मल अल नलर ये कु सरु अल ओर असे

तललम कर के अल की तुुीश ओर ता सैद की-

अल नलर ये ने इसलाम की ह्गत रुुुहल की तारुख पर गहर ओर दीरु पारा उदुल-

आल्लाहूँ कल मशियत

अन्यान्य शदुसमूहेर मध्ये मनसुर हान्नाजेर उद्देश्य छल ये,

इतलहसे गतीर एवं दीर्घसूारी प्रभाव फेलेछल।

[तथ्य सग्रह एवं अनुवाद: आसू साईद]

মাহবুবে ইলাহী হযরত নিযামুদ্দিন আউলিয়া'র খুত্বা সংকলন:

গ্রন্থনা: হযরত আমীর উলা সাঞ্জরী (রহ.)

অনুবাদ: কফিল উদ্দিন আহমদ চিশ্তী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দ্বিতীয় মঞ্জলিস

শুক্রবার ৮ই শাবান ৭০৭ হিজরী। হযরত খাজার চরণ চুম্বন করে ভাগ্যবান হলাম। মলিহ নামে আমার এক গোলাম ছিলো। আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতার নজরানা হিসেবে হযরত খাজা যিকরুল্লাহ বিল খায়েরের সম্মুখে এনে আযাদ করলাম। হযরত খাজা অনেক দোয়া খায়ের করলেন। মুক্ত গোলাম এ সময় হযরত খাজার কদমবুসি করলো এবং তাঁর নিকট বায়াত গ্রহণ করলো। ওয়াল হামদু লিল্লাহু আলা জালিক। হযরত খাজা বললেন, সলুকের এ পথে কৌলীন্যের কোন বিশেষ মূল্য ও দাসত্বের (গোলামী) জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। যে ব্যক্তি মুহাব্বাতের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে তার কর্ম সমাধা হবে। গজনীতে এক বুজুর্গ ছিলেন। তার জীরক নামের এক গোলাম ছিলো। সে এ পথে সিদ্দিকের দরজা হাসিল করেছিলো। যখন বুজুর্গের ইস্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো তখন তাঁর মুরীদগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার ইস্তেকালের পর আপনার গদীনশীন হবে কে? উত্তরে তিনি তাঁর জীরক নামের গোলামটির কথা বললেন যে জীরক আমার স্থলাভিষিক্ত হবে। সেই বুজুর্গের তিনজন পুত্র সন্তান ছিলো, যারা বয়প্রাপ্ত, চালাক, চতুর ও ধূর্ত ছিলো। জীরক এদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলো। তাই সে বললো আপনার সাহেবজাদারা আমাকে আপনার স্থলে বসতে দিবে না বরং তারা আমার প্রতি অত্যাচার করবে। বুজুর্গ বললেন, “তুমি কোন ভয় করো না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। যদি আমার সন্তানগণ তোমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাহলে আমি তাদের মাথা অবনমিত করাবো তোমার নিকট”। কিছু দিনের মধ্যেই সে বুজুর্গের ইস্তেকাল হলো এবং জীরক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলো। কিন্তু সেই বুজুর্গের সন্তানগণ তাঁকে শান্তিতে থাকতে দিলো না। তারা তাঁর সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করলো এবং বলতে লাগলো তোর এমন সাহস যে আমাদেরই গোলাম (ক্রীতদাস) হয়ে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করবি! আমার পিতার গদীতে বসবি? এ ঝগড়া নিত্য দিনের ঝগড়ায় পরিণত হলে জীরকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠলো। জীরক বুজুর্গের মাজারে যেয়ে অভিযোগ জানিয়ে বললো, আমি আপনার আদেশ পালন করে আপনার গদীতে বসেছি কিন্তু আপনার সাহেবজাদারা (সন্তানগণ) আমাকে বিতাড়িত করবে। আমি

অসহায়, আপনি আমায় সাহায্য করুন। অভিযোগ জানিয়ে ফিরে আসতেই সে খবর পেলো কাফেররা গজনী আক্রমণ করেছে এবং বাদশাহ তা প্রতিরোধ করার জন্য সব স্থান হতে যুবকদেরকে নির্বাচন করে নিয়ে যাচ্ছে। ইত্যবসরে বুজুর্গের তিন ছেলেকেই সে যুদ্ধের জন্য যেতে হলো এবং যুদ্ধে সব ছেলেই শহীদ হলো। এভাবেই বুজুর্গ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করলেন। জীরক কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আজীবন দু'রাকাত নফল নামায পীরের জন্য পড়ে গেছেন। ওয়াল হামদু লিল্লাহু আলা জালিক।

ব্যাখ্যা: হযরত আমীর উলা সাঞ্জরী (রহ.) তাঁর মলিহ নামের গোলামকে আযাদ করে দিয়ে হযরত মাহবুবে ইলাহী (রহ.)'র নিকট নজরানা হিসেবে পেশ করেন। মলিহ তৎক্ষণাৎ খাজার কদমবুসি করে বায়াত হন। তখন মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিযামুদ্দিন আউলিয়া ক্রীতদাস সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রদান করেছেন। মানব শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের কোরআনিক মানদণ্ড হচ্ছে “তাকওয়া”। এ প্রসঙ্গে ধারণা প্রদান করতে গিয়ে হযরত মাহবুবে ইলাহী ‘মুহব্বতের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত’ থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ঈমান, আকীদাহ এবং ত্বরিকত জগতে ‘মুহব্বত’-এর সোপান হচ্ছে প্রাথমিক এবং অত্যাাবশ্যিক। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) উল্লেখ করেছেন, “যে ব্যক্তি স্বীয় পরিবার পরিজনসহ যেকোন প্রিয় বিষয় এবং বস্তু হতে তাঁকে [নবীজী (দ.) সর্বাধিক প্রিয় হিসেবে দৃঢ়তা প্রদর্শন করবে না সে ব্যক্তি কখনো ঈমানে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে না”। কোরআনের ভাষায় ‘তাকওয়া’ মূলত আল্লাহ, রাসুল (দ.) এবং তাঁর নির্দেশাবলির প্রতি পরম আনুগত্য সহকারে পরিপূর্ণ সততা নির্ভর জীবনাচারকে নির্দেশ করে। তাকওয়া অর্জনের সঙ্গে মুহব্বত বা প্রেমের যোগসূত্র অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ‘মুহব্বত’-এর সংজ্ঞায় বিন্দু পরিমাণ অসতর্কতা, সংশয়, সন্দেহ, অবজ্ঞা-অবহেলাকে অমার্জনীয় অপরাধ হিসেবে বিবেচনায় রাখা হয়। অর্থাৎ ত্বরিকত পথের সারথীকে স্বীয় মুর্শিদের সঙ্গে প্রেমজাত সম্পর্ক সংরক্ষণ অথবা ছিন্ন হবার আশঙ্কায় সব সময় সতর্ক ও ভীত থাকতে হয়। এখানে শান্তির ভয়ের চেয়েও প্রেমিক প্রেমাস্পদের সুগভীর অন্তর্গত সম্পর্ক বিন্দুমাত্র শিথিল অথবা ছিন্ন হবার আশঙ্কাকে প্রাধান্যে রাখা হয়। এ কারণে মুহব্বতের সংজ্ঞায় জাহান্নামের ভয়ে ইবাদত বেহেশত প্রাপ্তির লোভে ইবাদত, এমনকি ইবাদতকে বিনিময়-মাধ্যম হিসেবে গণ্য করার কোন সুযোগ নেই। বরং প্রেমের একমাত্র ধারা হচ্ছে অসীম

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শনের লক্ষ্য হিসেবে যেকোন প্রকার কুরবানীকে আলিঙ্গন করা।

মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া ‘মুহব্বত’ সম্পর্কিত উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে ‘কৌলীন্য’- কে বিশেষ মূল্য এবং ‘দাসত্ব’ কে অমূল্য মনে করেননি। এ বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর নন্দিত মুয়াজ্জিন, বিশ্বনবী (দ.)’র একান্ত বিশ্বস্ত খাদেম, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হযরত বেলাল (রা.), সত্য সাধক মুজাহিদ হযরত আন্নার ইবনে ইয়াসির (রা.), হযরত উমর ফারুক (রা.)’র ব্যক্তিগত খাদেম হযরত আসলাম (রা.)’র অবস্থান এবং দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা করা যায়। এ ধরনের উপমা আসহাবে সুফফা সম্পর্কেও প্রযোজ্য, যাঁদের মর্যাদা এবং অবস্থানের বিষয়ে সতর্কতামূলক ওহী নাযিল হয়েছে।

দ্বিতীয় মজলিসে হযরত মাহবুবে ইলাহী ‘গদীনশীন’ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত এবং বিশদ আলোচনা করেছেন। গজনীর এক বুজুর্গের উপমা উপস্থাপন করে মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া বলেছেন, উক্ত বুজুর্গ নিজের পুত্রদের কাউকে স্থলাভিষিক্ত করেননি। বরং ‘জীরক’ নামের এক গোলামকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত এবং গদীনশীন করেছেন। এখানে উক্ত বুজুর্গের নিকট গোলামের স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন, স্বভাবজাত সহজ সরল, সৎ-নির্মোহ, নির্বিলাস জীবনাচার মূল্যায়িত হয়েছে এবং স্থলাভিষিক্ত গদীনশীন হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। তুরিকতের বিধিবদ্ধ নিয়ম এবং রীতি অনুসারে উক্ত বুজুর্গ তা ঘোষণা করে যান। বুজুর্গের জীবনকালে তাঁর পুত্ররা এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন বা বাদানুবাদ করেননি। উল্লেখ করা সঙ্গত যে, কোন বুজুর্গের উত্তরাধিকার নিযুক্তির বিষয়টির সঙ্গে ঐশী এবং পার্থিব মর্যাদা অন্তর্ভুক্ত আছে। সাধারণত ঐশী নির্দেশনা ব্যতীত কোন বুজুর্গ স্বীয় প্রতিনিধি বা গদীনশীন মনোনীত করেন না। উক্ত বুজুর্গের ইন্তিকালের পর গদীতে সমাসীন ‘জীরক’ নামের গোলাম যখন তুরিকতের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং লোকজন তাঁর সমীপে গমনাগমন করছেন তখন তাঁর পুত্রগণ পিতা কর্তৃক নিযুক্ত গদীনশীনকে অবজ্ঞা-অবহেলা এবং সবসময় নাজেহাল করতে থাকেন। বুজুর্গের তিন পুত্র কর্তৃক পর পর বাধাগ্রস্ত এবং নাজেহাল হবার পর অগত্যা গদীনশীন ‘জীরক’ সম্পূর্ণ অসহায় হিসেবে হাযির হয়ে সমস্ত ঘটনা বুজুর্গের রওজায় বিনীতভাবে পেশ করেন। বুজুর্গ কর্তৃক গদীনশীনের ফরিয়াদ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দ্রুত মঞ্জুর করেন। গদীনশীন অভিযোগ দাখিল করে ফিরে আসতেই সংবাদ আসে যে, কাফির কর্তৃক গজনী আক্রান্ত হয়েছে। গজনী রক্ষা এবং প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্যে বিভিন্ন স্থান থেকে যুবকদের সংগ্রহ করা হচ্ছে। বুজুর্গের তিন পুত্র তালিকাভুক্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে রণক্ষেত্রে তিন জনই শহীদ হন। আল্লাহ এভাবে তাঁর প্রিয় বান্দার অসিয়তের জিম্মাদার হিসেবে ওলীর

ওয়াদা বলবত রাখেন। গদীনশীন কর্তৃক জীরক স্বীয় মুর্শিদের ভূমিকায় চিরদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নফল নামায আদায় করেছেন। উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী সঞ্জরী (ক.)’ তাঁর প্রধান খলিফা হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন কুতবুল আকতাব হযরত কুতুবুদ্দীন বক্তেয়ার কাকী (রহ.) সমীপে। সুলতানুল হিন্দ স্বীয় পুত্রকে তুরিকতের তালিম গ্রহণের জন্যে হযরত বক্তেয়ার কাকী (রহ.)’র আনুগত্য গ্রহণের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)’র পীর এবং মুর্শিদ হযরত খাজা ফরিদুদ্দীন গঞ্জেশকর বাবা সাহেব কেবলা তাঁর খানকাহতে পরিচালিত লঙ্গর খানার খাদ্য বন্টনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন স্বীয় মুরিদ এবং ভাগ্নে হযরত খাজা আলী আহমদ সাহেব কালিয়ার (রহ.)’র উপর। একদিন বাবা সাহেব কেবলার এক পুত্র অযাচিতভাবে স্ব উদ্যোগে খাদ্য বন্টন করে ফেলেন। যথা সময়ে হযরত কালিয়ার (রহ.) খাবার বন্টন করতে এসে সমস্ত ঘটনা শুনে বিরক্তি প্রকাশ করেন। এ ঘটনায় আল্লাহর ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ ঘটতে বিন্দুমাত্র সময় লাগেনি। হঠাৎ গৃহাভ্যন্তরে কান্নার রোল ওঠে। জানা গেল বাবা সাহেব (রহ.)’র উক্ত পুত্র কোন প্রকার রোগ ছাড়াই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। বাবা সাহেবকে সমস্ত ঘটনা অবহিত করা হলে তিনি আল্লাহর সিদ্ধান্তই যথার্থ বলে জানিয়ে দেন। তুরিকত পন্থায় যে কোন অলীয়ে কামিল স্বীয় গদীনশীন বা খলিফা মনোনীত করেন খোদায়ী ইচ্ছায় ইলহামের নির্দেশনায়। কারণ কোন অলী স্বেচ্ছায় কাউকে গদীনশীন বা খিলাফত প্রদান করেন না। মোটকথা তুরিকতের উত্তরাধিকার মনোনয়নে কোন রকমের পক্ষপাতিত্বের সুযোগ নেই।

তৃতীয় মজলিস

শুক্রবার ১৫ই শাবান ৭০৭ হিজরী। জুমা’র নামাজের পর মাহফিলের কার্যক্রম শুরু হলো। আমি অধম আমার শায়খকে কদমবুসি করে ভাগ্যবান হলাম। এ সময় এক কমলাবৃত ফকীর দরবারে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ বসলো, তারপর চলে গেলো। এ দৃশ্যটি মজলিসের সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে হযরত খাজা বললেন, অনেক দরবার আছে যেখানে অপরিচিত খুব কম লোকই প্রবেশের সুযোগ পায়। এ সম্বন্ধে তিনি হযরত বাহাউদ্দিন যাকারিয়া মুলতানী (রহ.)-এর দরবারের কথা উল্লেখ করে বললেন যে, তাঁর দরবারে অপরিচিত খুব কম লোকই প্রবেশের সুযোগ পেত। কিন্তু আমার শায়খ হযরত খাজা ফরিদুদ্দিন মাসুদ গঞ্জেশকর রাহমাতুল্লাহি আলাইহির দরবার ছিলো ভিন্ন ধরনের। তাঁর দরবারে সব রকমের মানুষ ও দরবেশ প্রবেশ করতে পারতো। কারও জন্যই কোন বাধা-নিষেধ ছিলো না। আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু বিশেষ লোকও থাকে। এ সম্বন্ধে তিনি

হযরত যাকারিয়া রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একটি ঘটনার বর্ণনায় বললেন, একবার তিনি এক হাঙ্গামার সময় সফরে ছিলেন। পথিমধ্যে এক পলায়নরত দলের সঙ্গে লুকিয়ে পড়লেন। রাত নেমে এসেছিলো। অনেকেই ক্লাস্ত দেহ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। তিনি জাগ্রত, ইলাহীর যিকিরে মশগুল। হঠাৎ দেখতে পেলেন দলের মধ্য হতে একটি আলো (নূর) বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্রথমে তিনি একটু বিস্মিত হলেন। পরে ঐ নূর (ঐশী আলো) লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন এবং নূরের উৎস খুঁজে বের করলেন। দেখলেন এক বুজুর্গ মশগুল হয়ে আছেন আল্লাহর ধ্যানে। তাঁর নিকট যেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘আপনি এদের মধ্যে কেন’ উত্তরে তিনি বললেন, “হে যাকারিয়া আমি এদের সঙ্গে রয়েছি এজন্য যে, তুমি যাতে বুঝতে পার সাধারণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্বও থাকে”। ওয়ালহামদুলিল্লাহ্ আলা জালেক।

ব্যাখ্যা: হযরত মাহবুবে ইলাহীর তৃতীয় মজলিসের খুত্বা চলাকালে কামলাবৃত এক ফকির প্রবেশ করে কিছুক্ষণ বসে বের হয়ে যান। এ দৃশ্যটির প্রতি হযরত খাজা নিয়ামুদ্দীন আউলিয়া (রহ.)’র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি জানান ‘অনেক দরবার আছে যেখানে অপরিচিত খুব কম লোকই প্রবেশের সুযোগ পায়। উপমা হিসেবে তিনি হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী (রহ.)’র দরবারের নিয়মের কথা উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে স্বীয় শায়খ হযরত খাজা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জেশকর বাবা সাহেব কেবলার দরবারে সকল রকম পীর-দরবেশ, ফকির, মস্তান এবং সাধারণ মানুষের অব্যাহত যাতায়াত বিষয়েও তাঁদেরকে জ্ঞাত করেন। সেখানে কারো জন্যে কোন বাধা থাকতো না। এ ব্যাপারে তিনি সমবেতদের অবহিত করেন যে, সাধারণ মানুষের বেশে কিছু বিশেষ লোকও থাকে। তাসাওউফ জগতের অসীম সমুদ্রে বিভিন্ন মত-পথ ও ধারা বিদ্যমান রয়েছে। তাসাওউফ সাধকদের মৌলিক দায়িত্ব হচ্ছে হেদায়ত প্রাপ্তির লক্ষ্যে পথপ্রদর্শন করা। এখানে আগন্তকের ব্যাপারে কোন রকম শর্ত আরোপ করা চলে না। এটি অনেকাংশে মহাসমুদ্রে নানা প্রকৃতি এবং প্রজাতির অবাধ বিচরণের মতো উন্মুক্ত জায়গা। আল্লাহর ওলীদের দরবার তথা খানকাহর অবস্থানও মহাসমুদ্রের মতো। ওলী-আল্লাহদের দরবারে সুফি, দরবেশ, পাপী-তাপীসহ বিভিন্ন ধর্মের বিচিত্র পেশার মানুষের অবাধে প্রবেশের সুযোগ থাকে। ওলীদের মূলকর্ম হচ্ছে যেকোন মানুষকে হেদায়তের পথে আহ্বান জানানো। তাই তাঁদের দরবার অথবা খানকাহতে যে কোন লোকের প্রবেশাধিকার অব্যাহত।

এ প্রসঙ্গে হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.)’র একটি ঘটনা সুলতানুল মশায়েখ তাঁর খুত্বায় উল্লেখ করেছেন। মাহবুবে ইলাহী বলেন, একবার কোন এক হাঙ্গামার সময় হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.) সফরে ছিলেন। হাঙ্গামা লক্ষ্য

করে তিনি পলায়নরত একটি দলের সঙ্গে লুকিয়ে পড়েন। পলায়নরতরা ক্লাস্ত-অবসন্ন অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেও তিনি সারারাত জাগ্রত থেকে যিকিরে ইলাহীতে মশগুল থাকেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, পলায়নরতদের মধ্য হতে একটি আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তাঁর কাছে বিষয়টি আশ্চর্যজনক মনে হলো। তিনি ত্বরিত অনুসন্ধান করে দেখলেন এক বুজুর্গ সেখানে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন আছেন। এ রকম একটি দলের সঙ্গে কেন তাঁর অবস্থান তা জানতে চাইলে ধ্যাননিমগ্ন ব্যক্তি হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া (রহ.)-কে বলেছিলেন, তোমার অনুধাবনের জন্যে, যাতে তুমি বুঝতে পার সাধারণের মধ্যে বিশেষ ব্যক্তিত্বও বিদ্যমান থাকেন।

হযরত মাহবুবে ইলাহীর দরবারে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ গমনাগমন করতেন। তাতে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছিল না। চিশ্তীয়া খান্দানের অনেক আউলিয়ার দরবারে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা বায়াত গ্রহণ করতেন। মাইজভাগুর দরবার শরিফের প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ গাউসুল আযম হযরত শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাগুরী (ক.)’র নিকট নানা ধর্ম-বর্ণের অগণিত মানুষ আর্জি-ফরিয়াদ এবং ঐশী প্রেম-প্রেরণা নিয়ে গমনাগমন করতেন। এ বিষয়ে গাউসুল আযম মাইজভাগুরী (ক.)’র সুস্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, “যিছ দোকান মে হারচিজ রাহতা হ্যায়, ওয়ে আচ্ছা হ্যায়”। অর্থাৎ যে দোকানে সকল প্রকারের মালামাল বিদ্যমান থাকে, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

চতুর্থ মজলিস

শুক্রবার ২২ শে শাবান ৭০৭ হিজরী। কদমবুসির ঐশ্বর্য লাভ করলাম। হযরত খাজা আমাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাকে যে ছয় রাকাত নামায এশার পরে পড়তে বলা হয়েছিলো তা নিয়মিত পড় কি না? আরজ করলাম (বললাম), আপনার আদেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন যথার্থভাবে করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এরপর আয়্যামে বীজের রোজার কথা জিজ্ঞেস করলে বললাম রোজাও নিয়মিতভাবে করে যাচ্ছি। এরপর চাশতের নামায সম্বন্ধে জানতে চাইলে বললাম এ নির্দেশও পালন করে চলছি। এরপর বললেন ৪ রাকাত সালাতুস্ সায়াদাত নিয়মিত পাঠ করবে। আমি সম্মতি জানিয়ে কদমবুসি করলাম। আলহামদুলিল্লাহ্ আলা জালেক।

ব্যাখ্যা: চতুর্থ মজলিসে হযরত মাহবুবে ইলাহী ত্বরিকত সাধনার নিমিত্তে হযরত আমীর উলা সাঞ্জারী (রহ.)-কে প্রদত্ত ইবাদতের সবকসমূহের নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রাথরসরতা বিষয়ে অবহিত হবার জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং আরো নফল নামায ও ইবাদত সংযুক্ত করে দেন। নিজের মুরিদে প্রতি হাক্বুল্লাহ্ সম্পর্কিত নির্দেশনার আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় চিশ্তীয়া-নিয়ামিয়া ত্বরিকার উদ্ভাবক মাহবুবে ইলাহী সালাতে পঞ্জগানার পাশাপাশি নফল ইবাদতের উপরও সমগুরুত্ব দিতেন। (চলবে)

‘আয়নায়ে বারী’ কিতাবের ভাবার্থ এস এম এম সেলিম উল্লাহ

(পূর্ব প্রকাশের পর ৮ম কিস্তি)

পংক্তি

জগৎ করছে আলোকিত, তব ফয়েজের নুরী বাতি,
কিয়ামত তব্ গৌরবার্জন, করবে তাতে আদম জাতি।
হিম্মতের প্রভাবে তব বনে স্বর্ণ, এক মুষ্টি তুচ্ছ মাটি,
তুমি যে মূলের দুস্প্রমেয় ভাণ্ড গাউসুল আযম, মাটিরও রয় অবগতি।
“হাকিকতে মোতলাকা” [পূর্ণ বাস্তব পরিদৃশ্যমান] না হয়ে
শাম্মা/প্রদীপ সদৃশ দৃশ্যমান হওয়ার অন্য আরও কারণ এই
যে, ইহা “মাকামে ফানা ফিল্লা” (আল্লাহর মধ্যে বিলীন
হওয়ার স্তর) ও “বাকা বিল্লাহ্” [আল্লাহর মধ্যে স্থায়ীত্বের
স্তর]’র প্রতি ইশারা। অর্থাৎ চেরাগ বা প্রদীপ মাধ্যম ছাড়া
দীপ্ত হয়ে থাকে এবং অন্য কোনো বস্তু থেকে আপন জ্যোতি
অর্জন করে না। তদ্রূপ, “ফানা ফিজ জাত” (খোদার সত্তায়
বিলীন) ও “বাকা বিজ জাত” (খোদার সত্তায় স্থায়ীত্ব) প্রাপ্ত
আওলিয়া কেরামের হরকত সকুনাত্” (নড়াচড়া-স্থিরতা)
খোদা তায়ালার “আসমা ছিফাত” (নাম ও গুণ)’র
“তাজাল্লিয়াত” (উদ্ভাসনতা)’র জহর বা বহিঃপ্রকাশ হয়ে
থাকে।

পংক্তি

অক্ষয়ী ঐ সূর্যের জ্যোতি থেকে লভা রোশনী আমার,
ভবের কোন চেরাগ থেকে ধার করা নয় এ সাজ্ আমার।
ভবের সাকী হন মহাত্মা গাউসে মাইজভাগুরী আমার,
হীন দাস মকবুলকেও এক পেয়ালা দাও হে দয়ার।
“আল ইনসানু ছিররী ওয়া আনা ছিররুহ্” অর্থাৎ “মানুষ
আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য” হাদিসে কুদসীর এটাই
ইঙ্গিত। “কুরবে নাওয়ামেল” বিষয়ক হাদীসে কুদসী “লা
ইয়াজালু আবদীল মুমিনি ইয়াতাকাররাবা ইলাইয়া
বিল্লাওয়ামিলি হাত্তা উহিব্বাহ্, ফা’ইজা উহিব্বাহ্ কুনতু
ছাময়াল্লাজি ইয়াছমাউ বিহি, ওয়া বাছারাহ্ল্লাজি ইউবছিরু
বিহি, ওয়া ইয়াদাহ্ল্লাতি ইয়াবতিশু বিহা ওয়া রিজলাহ্ল
ল্লাতি ইয়ামশি বিহা, ওয়াফিলফজিন আখিরিন বিইয়াছমাযো, ওয়া
বি ইয়াবছিরু, ওয়া বি ইয়াবতিশু, ওয়া বি ইয়াকিলু। অর্থাৎ
আমার বান্দা সর্বদা নফল ইবাদতের দ্বারা আমার নৈকট্য
অর্জন করতে থাকে, এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার
এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নিই যে, আমি তার কান হয়ে যাই যা
দিয়ে সে শুনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে,
আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে স্পর্শ করে, আমি তার
পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে। অন্য এক বর্ণনায় আছে।
আমার সাথে শুনে, আমার সাথে দেখে, আমার সাথে স্পর্শ
করে এবং আমার দ্বারা বুঝে। হাদিসটি এটারই বর্ণনা। এমন
ওলি মূলত খোদা তায়ালার ভাষ্যকার হন। তাঁদের ইচ্ছা
নিশ্চিত খোদারই ইচ্ছা।

পংক্তি

উহাই তোমার প্রত্যাশা যা প্রত্যাশা খোদার,
প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের উদ্দেশ্য হয় একাকার।

তাঁদের কথাবার্তা খোদারই কথাবার্তা।

পংক্তি

তাঁদের বাণী হয় খোদারই বাণী (শাস্বত),
যদিও বা হয় খোদার বান্দা বাণী দৃশ্যত।

তাদের সাহচর্যে “কুনু মায়াল্লাহ্” অর্থাৎ “খোদার সাথে
থাকো” বাণীর রহস্যের প্রকাশ পায়।

পংক্তি

খোদার সঙ্গে যদি বসিবার চাও,
তবে আউলিয়ার সম্মুখে গিয়ে বসে যাও।

তাঁদের জাহেরী “সুরত” দুনিয়া ও আখেরাতের খোদার রহস্য
ও খোদার প্রতিবিম্ব।

কবিতা

আম্বিয়া ও আউলিয়া হন রহস্য খোদার,
খোদার ‘জাত’ ও ‘সিফাত’ সত্তা পূর্ণ ফানা যার।
তারাই যে! তাঁরাই হন প্রতিবিম্ব খোদার,
যদিও প্রকাশ্য সুরতে মানব আকার।

রাসুলে খোদা (দ.) ইরশাদ করেছেন, “মান রায়ানী ফাকাড
রা’য়াল হক’ অর্থাৎ “যে আমাকে দেখেছে, সে হক (খোদা)
দেখেছে”। জাহেরী আলেমগণ এই হাদিসের অর্থ করেছেন
এভাবে যে, যে আমাকে দেখেছে সে সত্যই দেখেছে, অর্থাৎ তাঁর
আমাকে দেখা শুদ্ধ আছে, ভুল নয়। অর্থাৎ ফিল হাকিকত সে
আমাকে দেখেছে, অন্যকে দেখে নাই। কেন না শয়তান আমার
সুরত ধারণ করতে পারে না। হ্যাঁ, এটাও এক অর্থ যে, এতে
আহলে জাহেরের পিপাসা নিবারণ হয়। কিন্তু হাকিকতের সূক্ষ্ম
জ্ঞানে বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রই এই হাদিসের অন্য অর্থ বুঝে নেন।
জেনে রাখা দরকার যে, অভিধানে যে বস্তুর হাকিকত অবিচল
ও বিশ্লেষিত হয়ে গিয়েছে এটাকেই হক বা সত্য বলা হয়
এবং আরবীতে হক শব্দের বিপরীত শব্দকে বাতিল বলা হয়।
মোহাক্কেকীনে আহলে হক্কের মসরবে বাস্তব পক্ষে হক
তায়ালার “হাকিকতে মোতলাকা” ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর
“অজুদে মোতলাকা” [পূর্ণ অস্তিত্ব] একচ্ছত্রভাবে সাব্যস্ত নয়।
সেই জাতে পাকের ওয়াজুদ (অস্তিত্ব) ও জহর (বিকাশ) ভিন্ন
অন্য সকল বস্তুর ওয়াজুদ (অস্তিত্ব) ও জহরে কুল (পূর্ণ
বিকাশ) অগ্রাহ্য ও অপ্রমাণিত। এবং বারী তায়ালার আসমায়ে
হুসনা (সুন্দর নামাবলি)’র মধ্যে “ইসমে হক্ক” বা হক্ক নামটির
এটাই অর্থ। অতএব, “হাস্তিয়ে আলম” (জগতের অস্তিত্ব)
“নিস্ত হাস্তে নুমা” (অস্তিত্ব প্রকাশকারী অনস্তিত্ব)। ইহাকে হক্ক
বলা হয় “মাজায়ান” (রূপক অর্থে)। (চলবে)

একুশ শতকে মুসলিম উম্মাহর চ্যালেঞ্জ: প্রেক্ষাপট, সমস্যা এবং সমাধান জাবেদ বিন আলম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফরাসী বিপ্লব

সম্রাটের সর্বাঙ্গিক ক্ষমতা, যাজক, অভিজাত এবং সাধারণ মানুষ (চাকুরীজীবী, অধ্যাপক, আইনজীবী, ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষক, মজুর, ব্যবসায়ী সব পেশার লোকই সাধারণ মানুষের অন্তর্ভুক্ত) প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণিতে বিভক্ত কথিত এক কৌলীন্য অহমিকার সমাজ কাঠামোর জঞ্জালে আবদ্ধ ছিল বিপ্লবপূর্ব ফ্রান্স। সম্রাটই রাষ্ট্র, সম্রাটের নির্দেশই আইন, যাজক, অভিজাতরা সমাজের নিয়ন্ত্রণ শক্তি এবং কর সুবিধাভোগী আর সাধারণ মানুষ করভারে পিষ্ট-নির্যাতিত। সম্রাট-যাজক আর অভিজাতদের পারস্পরিক সখ্যতায় বিত্ত-বৈভবের বিলাসী জীবনের অবশিষ্ট হিসেবে অসাম্য, পীড়ন-নির্যাতনে অতিষ্ঠ ভেদরেখার অধিকারী অসংখ্য মানুষের হা-হুতাশে ভরপুর তৎকালীন বিশ্ব বলয়ে দাম্ভিক-সাম্রাজ্যলোভী ফ্রান্সের এটিই ছিল অভ্যন্তরীণ সামাজিক পরিচিতি। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের গণ-অধিকারমুখী প্রবণতা এবং জনতার উৎসাহ ফরাসী সমাজের কথিত আভিজাত্যের অন্তঃমূলে প্রচণ্ড আঘাত আনে। সংঘটিত হয় ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রেরণা শক্তি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ হলেও দার্শনিক চেতনা নির্মিত হয় মন্টেস্কু, ভলতেয়ার, রুশো, দিদারো'র মতো বিশ্ব পরিচিত মনীষার চিন্তাধারার যুগপৎ সমন্বয়ে। অন্যদিকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বৃটিশ দার্শনিক জনলকের সমাজচিন্তা। জনগণের সম্মতি ব্যতীত অন্য মানুষের উপর শাসন কাজ চালানো অথবা অন্য মানুষকে শাসন করার কোন অধিকার কোন ব্যক্তি বা মানুষের নেই। বৃটিশ সমাজ চিন্তাবিদ জনলকের উপর্যুক্ত তাত্ত্বিক ধারা আমেরিকা থেকে বৃটিশ উপনিবেশ বিতাড়িত করার মূল প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। যতো সীমাবদ্ধতার কথা বলা হোক না কেন, নানামুখী তীর্যক সমালোচনার মুখেও একবিংশ শতাব্দীর আজকের দিন পর্যন্ত সৃষ্টিমুখী পরিবর্তন পরিমার্জনের মাধ্যমে এখনো আমেরিকা জনসম্মতি এবং জবাবদিহিতার ভিত্তিতে নিজস্ব গণতান্ত্রিকধারা চলমান রেখেছে।

ফরাসী বিপ্লবের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। অনৈক্য, অরাজকতা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতার কারণে বারবার দখলে বেদখলে ন্যূজ ইউরোপের জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্ব স্ব ভূখণ্ডের স্বাধীনতা অর্জনে প্রেরণা যুগিয়েছে ফরাসী বিপ্লব। সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নন্দিত আদর্শ ইতালীর ঐক্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। দার্শনিক যোসেফ ম্যাজিনি বীর যোদ্ধা গ্যারিবল্ডি, রাষ্ট্রনায়ক ক্যামিলি ক্যাভুর এবং উদারপন্থী রাজা

ভিক্টর ইম্যানুয়েলের সমন্বিত চিন্তা এবং কর্মের ভিত্তিতে ইতালী অস্ত্রিয়ার দখলবাজি থেকে মুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে সক্ষম হয়। অথচ ইতালীকে ঐক্যবদ্ধ করতে পঞ্চদশ শতকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানী নিকোলো মেকিয়াভেলী জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ধারণার সূচনা করেন। ফরাসী বিপ্লব জার্মানীর একত্রীকরণ এবং রাশিয়ার মধ্যযুগীয় রক্ষণশীলতা দূরীকরণের প্রণোদনা সূত্র হিসেবে কাজ করেছে। ইউরোপের ধুরন্ধর কুটনীতিক রাজনীতিক অটোফম বিসমার্ক অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতির যুগপৎ সমন্বয়ে ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট উভয় গোষ্ঠীর সঙ্গে নমনীয় আচরণের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর গোড়াপত্তন করেন।

ফরাসী বিপ্লবের উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনা ইউরোপের জনমানসে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলেও খোদ ফ্রান্সে স্বল্প সময়ের মধ্যে ১০ অক্টোবর ১৭৯৩ থেকে ২৮ জুলাই ১৭৯৪ ব্যাপ্তিকালে চলেছে বর্ণনাতীত ত্রাসের রাজত্ব। বিপ্লবকালের ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই ১৭৯৩ সালের ২১ জানুয়ারি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে রাজতন্ত্রের সমর্থকরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ফরাসী বিপ্লবের পর 'সাধারণ ক্ষমা' প্রশ্নে উদার দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে বিপ্লবীরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফরাসী বিপ্লবে সরাসরি যুক্ত গিরোন্ডিল দল প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতে সন্তুষ্ট থাকলেও রোবসপিয়ারের নেতৃত্বাধীন জে কোবিন দল বিপ্লবকে নিরাপদ করার জন্যে "মুক্তির স্বৈরতন্ত্র" নামে বল প্রয়োগের এক অভিনব প্রক্রিয়া চালু করে। রোবসপিয়ারের নিকট ক্ষমা বিষয়টি ছিল বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত মুক্তির স্বৈরতন্ত্র 'সন্দেহ আইনে বিচারের জন্যে' গঠন করে জন নিরাপত্তা কমিটি। সন্দেহ আইনে যে কোন ব্যক্তিকে বিপ্লবী বিচারালয়ের সম্মুখীন করে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ্যে রাজপথ দিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিলোটিনের আঘাতে শিরচ্ছেদ করা হতো। শুধুমাত্র প্যারিসে এক হাজার লোককে এভাবে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে সম্রাট ষোড়শ লুই-এর স্ত্রী মেরী আঁতোনেত, মাদাম বোঁলে এবং বিপ্লবের অন্যতম শরিক গিরোন্ডিল দলের ত্রিশজন সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাময়িক সময়ের জন্যে ফ্রান্সের অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও 'বিপ্লবী আদর্শ' রক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারিতা এবং ত্রাসের রাজত্ব অনেকের মধ্যে অসহ্য যাতনার সৃষ্টি করে। ফলে ফ্রান্সের বিভিন্ন দল উপদল রোবসপিয়ারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আকস্মিকভাবে একদিন সকল বিরোধী দল মিলে রোবসপিয়ার এবং তার অনুগামীদের ধরে নিয়ে গিলোটিনে হত্যা করলে

ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটে। বিপ্লব পরবর্তী সাধারণ ক্ষমার অনুপস্থিতির ভয়ানক দুঃসংবাদ হচ্ছে বিপ্লবীরাই প্রথম ফরাসী বিপ্লবের হত্যাকারী।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের উত্থান

ফরাসী বিপ্লবের পর রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। কিন্তু বিপ্লব পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে অস্থিতিশীলতা, নৈরাজ্য, নিরাপত্তাহীনতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস, সকল প্রকার ভেদাভেদ ভুলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগের অভাবে অস্বাভাবিক অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে পড়া ফরাসী জনগণ প্রতিভাবান শক্তিশালী সম্মোহনী নেতৃত্বের উপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আভিজাত্যের পরশহীন সাধারণ শ্রেণিভুক্ত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট অসামান্য প্রতিভাগুণে ফ্রান্সে বিরাজমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধান করে জাতির নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে গণ্য হন। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের প্রতি নেপোলিয়ন ছিলেন শ্রদ্ধাশীল এবং আস্থাবান। মন্তেস্কু-রুশোর মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত নেপোলিয়ন গণমানুষের প্রতিভার বিকাশমুখি অর্ধ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উদ্যমী ভূমিকা রাখেন। তাঁর সাহস, যুদ্ধ বিদ্যা, রণকৌশল জনমনে যাদুমন্ত্রের মতো প্রভাব বিস্তার করেছিল। একদল ছিন্নবসন পরিহিত এবং অর্ধ-সজ্জিত সেনাবাহিনী নিয়ে নেপোলিয়ন দ্বিগুণ সংখ্যক অস্ট্রিয়ান ও সার্বিয়ান সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে দু'টি শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ-রাজাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। এদিকে গৌরবলোভী ফরাসী জাতির মধ্যে নেপোলিয়ন সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব হিসেবে আবির্ভূত হন। ফরাসীরা তখন নেপোলিয়নের নামে অভূতপূর্ব গৌরববোধ করত। নেপোলিয়নের জনকল্যাণমূলক সংস্কার, অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিপ্লবের সামরিক সাফল্য ফরাসী জনগণের মধ্যে পরম শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সমাদৃত হন। যশ, খ্যাতি, গৌরব এবং নন্দন প্রত্যাশী ফরাসীরা তাদের জাতিগত অভিলাষ এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার অনুকূলে নেতৃত্বের গুণাবলি নেপোলিয়নের মধ্যে বিরাজমান লক্ষ্য করে নির্বিবাদে তাঁরা তাঁকে সম্রাট হিসেবে বরণ করে নেন। অথচ ফরাসী বিপ্লবের মূল স্লোগান ছিল 'রাজতন্ত্রের' অবসান।

বিপ্লব পরবর্তী বিদ্বৈষমূলক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নেপোলিয়ন দেশত্যাগী অভিজাত এবং বিপ্লব বিরোধী যাজকদের বিরুদ্ধে আরোপিত বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার এবং সমসুযোগ নীতি প্রবর্তন করেন। রাজনৈতিক দলাদলির উচ্ছেদ সাধনের লক্ষ্যে তিনি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোযোগী হন। উদারনীতি অবলম্বন করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিভার সমাদরকে তিনি প্রাধান্যে আনেন। ফ্রান্সে রোমান ক্যাথলিক চার্চ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে রোমের পোপের সঙ্গে

শান্তিপূর্ণ আপোষ মীমাংসায় উপনীত হন। বিপ্লবের পর ফ্রান্সে পোপের সম্পত্তি জাতীয়করণ হয়েছিল। নেপোলিয়ন উক্ত বিধান অব্যাহত রেখে চার্চের অনুমোদনে সরকার কর্তৃক কর্মচারী নিযুক্তি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক যাবতীয় ব্যয়ভার প্রবর্তন নীতি জনগণ কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অভিনন্দিত হয়। ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদ নীতিকে বরণ করে তা প্রয়োগের জন্য সামাজিক সমতা এবং ধর্মীয় সহিষ্ণুতা প্রবর্তন করে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যনীতির অবসান ঘটিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন আইন এবং বিধি বিধানের সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করে ফ্রান্সে নতুন যুগের সূচনা করেন। নেপোলিয়নের গণমুখী এ সকল নীতি কোড অব নেপোলিয়ন নামে খ্যাত। সামন্ত অর্থনীতির পরিবর্তে ব্যাংক অব ফ্রান্স প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক অর্থনীতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার, জাতীয় শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার পাশাপাশি তিনি ছিলেন 'ইউনিভার্সিটি অব ফ্রান্স'র প্রতিষ্ঠাতা। সহজ-সাধ্য যাতায়াতের জন্য খাল খনন, রাস্তাঘাট-সেতু নির্মাণ এবং ঐতিহ্য ও অতীত সংরক্ষণের জন্যে মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা করে রাজধানী প্যারিসকে সুসজ্জিত করেন। প্রকৃত গুণী ব্যক্তিত্বদের সম্মান এবং মর্যাদা প্রদানের জন্যে তিনি 'লিজিয়ন অব অনার' সৃষ্টি করে সম্মান ও গৌরব মোহী ফরাসীদের মনজয়ে সক্ষম হন। তাঁর প্রবর্তিত 'লিজিয়ন অব অনার' এর একটি রেশমী ফিতা এখনো ফরাসীদের সাজ-সজ্জায় আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে সমাদৃত হয়ে আছে।

সম্রাট নেপোলিয়নের মধ্যে এক ধরনের স্ববিরোধিতা বিদ্যমান ছিল। ফরাসী বিপ্লবের বিভিন্ন কর্মসূচি অকপটে বাস্তবায়ন করলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল তাঁর নিকট অসহনীয়। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রীকে আলিঙ্গন করে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন, I am The Revolution. একই সঙ্গে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং স্বদেশে জাতীয়তাবাদকে প্রাণস্পর্শী আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে স্পেন-জার্মানী প্রভৃতি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে এ সব দেশের জাতীয় চেতনাকে অস্বীকার করেন। এ কারণে তিনি নিজেই বলেছেন 'I Have Destroyed The Revolution' অর্থাৎ আমি বিপ্লবকে ধ্বংস করেছি। এ দিক থেকে নেপোলিয়নকে ফরাসী বিপ্লবের বিনাশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও অনেক অবদানের কারণে তিনি ফ্রান্সে ফরাসী বীর নেপোলিয়ন হিসেবে এখনো সমাদৃত এবং ইতিহাসে সমুজ্জ্বল।

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন সম্রাট হিসেবে অভিষিক্ত হন। এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত উক্তি: 'I Found The Crown of France Lying On The Ground and Picked It up With My Sword'. অর্থাৎ ফ্রান্সের রাজমুকুট মাটিতে পতিত অবস্থা থেকে আমি পেয়েছি এবং আমার অস্ত্রের সহিত তা উঠিয়ে নিয়েছি। বীরত্ব এবং গৌরব

অভিলাষী ফরাসী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে তিনি সমগ্র পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের পদক্ষেপ হিসেবে ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যে সফল যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। সমগ্র ইউরোপে নেপোলিয়ন ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নকে প্রতিহত করার জন্যে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, রাশিয়া, সুইডেন মিলে রাষ্ট্রজোট গঠিত হয়। কিন্তু অদমনীয় নেপোলিয়ন সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের পাশাপাশি ফরাসী বিপ্লবের আদর্শের আলোকে সমাজ পরিবর্তনের কর্মসূচি সংযুক্ত করে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং ভূমি দাসপ্রথা অপসারণের মাধ্যমে বিপ্লবকে ইউরোপের উপর চাপিয়ে দেন। বৃটিশদেরকে তিনি ‘মুদীর জাতি’ নামে অবজ্ঞা ভরে অভিহিত করে তাদের প্রতি বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপ করেন। ইউরোপ জুড়ে নেপোলিয়নের বিজয় কেতন পৃথিবীব্যাপী নানামুখি আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কিন্তু স্পেনে জাঘত জনতার জাতীয় চেতনাকে তিনি অস্ত্রের সাহায্যে জয় করতে পারেননি। একই সঙ্গে মস্কো অভিযানের ভাগ্য বিড়ম্বিত ফল সৈন্যবাহিনীকে প্রায় ধ্বংসের মুখোমুখি করে এবং ওয়াটারলুর যুদ্ধে সেনাবাহিনীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাগ্য রবিও অন্তিমিত হয়। নেপোলিয়ন তাঁর পতনের জন্যে তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন, ১. স্পেন, ২. পোপ, ৩. রাশিয়া।

পৃথিবী বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ সেনাপতিদের অন্যতম একজন হলেন নেপোলিয়ন। পৃথিবী জয়ের অসীম ধারণায় তিনি এতো বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন যে, মানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কিত ঐশী সিদ্ধান্ত তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। ইউরোপীয় জগতের অনন্য গুণীদের তিনি কদর দিতেন, সম্মান করতেন অকপটে-অমলিন অন্তরে। তিনি নিজেই গুণীদের সান্নিধ্যে আসতে সচেষ্ট থাকতেন। ১৮০৮ সালে জার্মান প্রতিভা কবি গ্যাটের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ জ্ঞানালাপ হয়। এক পর্যায়ে কবি গ্যাটে তাঁকে ভল্টেয়ারের নাটক অনুবাদ করছেন বলে অবহিত করেন। ভল্টেয়ার তাঁর লেখায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র চরিত্র চিত্রনে কলঙ্ক লেপন করায় নেপোলিয়ন গ্যাটেকে বলেন, “ভল্টেয়ার ফাজলামি করেছে”। এ সময় তিনি উল্লেখ করেন, “মুহাম্মদের ধর্মই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়”।

ইউরোপের ঐক্য প্রচেষ্টা এবং ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের সমরভিযান ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র নিদারুণভাবে ওলট-পালট করে দেয়। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র পুনঃনির্ধারণের জন্যে ১৮১৫ সালে অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় তুরস্ক এবং পোপের রাজ্য ব্যতীত সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হন। ভিয়েনা সম্মেলনে তৎকালীন পঞ্চ বৃহৎ শক্তি রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার, অস্ট্রিয়ার চ্যাম্বেলর প্রিন্স মেটারনিকের প্রুশিয়ার রাজ প্রতিনিধি হার্ডেনবুর্গ, বৃটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাসলবিয় এবং ফ্রান্সের মুখপাত্র তালেরাঁ উপস্থিত ছিলেন। ২৩ বছরের যুদ্ধে

দখল-বেদখলের কারণে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানা বারবার পরিবর্তিত হয়েছিল। এ ছাড়া বৃহৎ শক্তিসমূহের পারস্পরিক স্বার্থের সংঘাত সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করে। এরপরেও ১. ন্যায্য অধিকার, ২. রাষ্ট্রসমূহে শক্তি সাম্য এবং ৩. ক্ষতিপূরণ দান বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইউরোপে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বাভাস তথা রাজবংশসমূহের শাসনাধীনে পুনঃপ্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। ফ্রান্সের পূর্ববর্তী সীমানা অক্ষুন্ন রেখে ফরাসীরা যাতে পুনর্বার ইউরোপের শক্তি ও সহাবস্থানে বিঘ্ন ঘটতে না পারে সেজন্যে শক্তিশালী রাষ্ট্র দ্বারা ফ্রান্সকে পরিবেষ্টনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ধরনের রাষ্ট্র পুনঃগঠন এবং ব্যবস্থা ফরাসী বিপ্লবের সুফলভোগী ইউরোপের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়।

ভিয়েনা কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন, স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তাবিধানের জন্যে কুটনীতিবিদের অনুসৃত পন্থায় গড়ে তোলা হয় ‘ইউরোপীয় শক্তি সমবায়’। এ সময় দুটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। একটি Holy Alliance তথা পবিত্র সন্ধি, অন্যটি চতুঃশক্তি তথা Quadruple Alliance। এ দুটি চুক্তির মাধ্যমে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বভাব এবং ঐক্য বন্ধন করার শিরোনাম হচ্ছে কনসার্ট অব ইউরোপ (Concert of Europe)।

‘পবিত্র সন্ধি’র উদ্যোক্তা ছিলেন ভিয়েনা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী রাশিয়ার জার প্রথম আলেকজান্ডার। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণ, ভাবপ্রবণ এবং আদর্শবাদী সম্রাট। উদার চিন্তায় কর্ম এবং অতীন্দ্রিয়বাদ আদর্শের সংমিশ্রণে গড়া তিনি এক অদ্ভূত রাজনীতিবিদ। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্ট ধর্মের তিনটি মূলনীতি ক. ন্যায়, খ. দয়া এবং গ. শান্তির উপর ভিত্তি করে ইউরোপের রাষ্ট্রনেতারা স্ব স্ব দেশের অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের বিষয় ছিল পবিত্র সন্ধির মৌলিক শর্ত। চুক্তিবদ্ধ নেতারা নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বল্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে প্রজাদেরকে পুত্রতুল্য প্রতিপালন করবেন। তুরস্ক এবং ইংল্যান্ড ব্যতীত ইউরোপের সকল দেশ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। জার আলেকজান্ডার-এর অকপট মানবপ্রেম এবং উচ্চ আদর্শ ছিল উক্ত চুক্তির প্রধান ভিত্তি। পার্থিব জগতে চলমান কুটনীতি এবং অপকৌশলের কাছে এ ধরনের আদর্শের অবস্থান ছিল অবাস্তব বিষয়। পবিত্র সন্ধির স্বাক্ষরদানকারী অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটারনিকের মতে “এটি উচ্চস্বরের আওয়াজ ব্যতীত অন্য কিছু নয়”। উদারপন্থীদের নিকট এটি ছিল জাতীয়তা এবং গণতন্ত্রের স্বাসরোধকারী স্বেচ্ছাচারী শাসকদের একটি অপবিত্র লীগ। জার আলেকজান্ডার ব্যতীত অন্য কেউ এটিকে মনে প্রাণে মেনে নেননি। আলেকজান্ডারের সখের ধ্যানের এই পবিত্র সন্ধি ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর

পর শেষ হয়ে যায়। তবে এতে ইউরোপীয় লীগের একটি প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছিল, পরবর্তীতে তা অস্পষ্ট আকারে হলেও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের নীতি নির্ধারণে প্রতিফলিত হয়েছে।

পবিত্র চুক্তির পরপর সমকালীন বাস্তবতায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো ইউরোপীয় শক্তি সমবায় গঠন করে। অস্ট্রিয়ার মেটারনিক ছিলেন এই চুক্তির মূল উদ্যোক্তা। ইংল্যান্ড-অস্ট্রিয়া-রাশিয়া-প্রুশিয়ার মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তির শর্ত ছিল ১. ফ্রান্সের সঙ্গে সন্ধির শর্তাবলি বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতে ফরাসী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ২. ইউরোপের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা, ৩. বিশ্বের মঙ্গলের জন্যে চারি শক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাব বজায় রাখা এবং ৪. ইউরোপের শান্তি এবং প্রগতি বজায় রাখার লক্ষ্যে জটিল সমস্যাসমূহ নিরসনের জন্যে মধ্যে মধ্যে কুটনৈতিক সম্মেলনে সমবেত হওয়া। এই চুক্তি প্রকৃত পক্ষে তৎকালীন বৃহৎ শক্তিদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করে। ভদ্রতা, সামাজিকতা, সুমধুর ব্যক্তিত্বের আড়ালে ধুরন্ধর চক্রান্তকারী সুবিধাবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল মেটারনিক ছিলেন উপর্যুক্ত চুক্তির আড়ালে উদারনৈতিক চিন্তা-চেতনা দমনে সর্বাধিক তৎপর নৃপতি। চতুঃশক্তির সন্ধির ভিত্তিতে মেটারনিক মূলত জাতীয় স্বাধীনতা এবং নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সকল প্রকার সংগ্রাম নির্মূলে সক্রিয় হলে ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বিপ্লব সম্পন্ন হয়। এর প্রভাব পড়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। ফ্রান্সের বিপ্লবসমূহের প্রতিক্রিয়া এতোই তীব্র আকার ধারণ করে যে, বিভিন্ন দেশে মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি খোদ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে মেটারনিকের গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের মুখে মেটারনিক দেশ থেকে পালায়ন করে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নেন।

ফরাসী বিপ্লবের চেতনা ফ্রান্সের জনগণের মধ্যে এতো গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, সর্বাবস্থায় মনে করা হতো ফ্রান্স আগেয়গিরির উপর ঘুমাচ্ছে। ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পর সুকৌশলে সম্রাট নেপোলিয়নের ভাইপো তৃতীয় নেপোলিয়ন ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট হন। তিনি পুনরায় স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্যারিস শহরে উন্নয়ন সাধনের পর ১৮৬০ সালে স্বৈরাচারী শাসনের মাত্রা কমিয়ে উদারনৈতিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলে সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে অপ্রয়োজনীয় মেক্সিকো অভিযান এবং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জার্মান যুদ্ধে মিত্রহীন ফ্রান্স পরাজিত হলে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন জার্মান সেনাবাহিনীর হস্তে বন্দী হন। এর ফলে সম্রাটের অপমানজনক পরিণতি প্রত্যক্ষ করে ফরাসী পার্লামেন্ট তাকে পদচ্যুত করে ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় রাশিয়াতেও। প্রথম

নিকোলাসের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ক্ষমতাসীন হয়ে পূর্ববর্তীদের রক্ষণশীলতা এবং স্বৈরাচারী পন্থা পরিহার করে উদারনৈতিক সংস্কার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মূলতঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ সঙ্কট অনুধাবন করে তিনি বিদ্রোহীদের শাস্তি মওকুফ, সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণের অবসান, গুপ্ত পুলিশ বাহিনী লোপ, ভূমিদাস প্রথার অবসান, শিক্ষা সংস্কার, স্বায়ত্বশাসন ও বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন করে ইউরোপে চলমান উদারনৈতিক কর্মপন্থাকে অগ্রবর্তী করার উদ্যোগ নেন। দীর্ঘ সময় ধরে বিচার বিভাগে সরকারী নজরদারী এবং নিয়োগ পদ্ধতিতে সুকঠিন নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকায় উপর্যুক্ত বিষয়ে সাফল্য আনার ক্ষেত্রে যোগ্য বিচারকের অভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তিত হলেও ঘন ঘন কৃষক বিদ্রোহ, নিহিলিস্টদের অতি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কারণে তিনি উদার পন্থা প্রত্যাহার করেন। তাঁর এই পদক্ষেপকে নিহিলিস্টরা বর্বর পন্থায় প্রতিশোধ নেয় এবং তাঁকে হত্যা করে। এতে লক্ষ্য করা যায় সাধারণ মানুষ মৌলিক অধিকারের প্রতি কতো বেশি মুগ্ধ ও সন্তুষ্ট ছিল।

সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান

পৃথিবীর মানুষ আধুনিক রাজনৈতিক সংগঠনের জন্যে বৃটিশ চিন্তাধারার নিকট ঋণী। ১২১৫ খ্রিস্টাব্দের ম্যাগনাকার্টা তথা মহাসনদ, ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে পিটিশন অব রাইটস, ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের পর ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দের অধিকারের বিল তথা বিল অব রাইটস, ১৭০১ খ্রিস্টাব্দের অ্যাকট অব সেটেলমেন্ট, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মহাসংস্কার আইন এবং ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং যুগ চাহিদা অনুযায়ী শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের মাধ্যমে শুধু ইউরোপ নয় আধুনিক পৃথিবীর সংসদীয় গণতন্ত্রের মাতৃভূমি হিসেবে গ্রেট ব্রিটেন বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত। টমাস হবস, জনলকের মতো প্রতিভাধী গুণী চিন্তাশীল মনীষার মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব এবং গণতন্ত্রের যে অভিযাত্রা গ্রেট ব্রিটেন শুরু করেছিল তা এখনো দীপ্যমান রয়েছে। সমাজ বিবর্তনের গতিপ্রবাহ সম্পর্কে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে বিবর্তনমুখী ধারার মধ্যেও বৃটিশ রাজা-রাণীর মুকুট রাষ্ট্রক্ষমতার সৌন্দর্য সংরক্ষণ এবং পরিবর্তনে ভূমিকা রেখে চলছে। এটি ইংরেজ জাতির ঐতিহ্য প্রীতির নমুনা। আধুনিক ব্রিটেনের রাজনৈতিক পদ্ধতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জনলকের চিন্তাধারার ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। তিনি ছিলেন প্রোটোস্ট্যান্ট সমর্থক, কটর ক্যাথলিক বিরোধী, সর্বোপরি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে প্রবল নেতিবাচক ধারণা পোষণকারী। এরপরেও আধুনিক পৃথিবীতে জনলক প্রবর্তিত জনসম্মতি ভিত্তিক সরকার গঠনতন্ত্র তথা জনগণের ভোটে নির্বাচিত জবাবদিহিমূলক দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থাই অধিকমাত্রায় জনপ্রিয় অবস্থানে সমাদৃত হচ্ছে। আধুনিক

ইউরোপ-আমেরিকা-কানাডাসহ পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশসমূহের কাঠামো বিনির্মাণে জনলকের অবদান পথিকৃত হিসেবে কাজ করে চলেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান

আধুনিক পৃথিবীর এক বিস্ময়কর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে বৃটিশ দার্শনিক জনলকের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে আমেরিকায়। স্পেন, পর্তুগীজ, ফরাসী এবং বৃটিশদের পর্যায়ক্রমিক দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে জনলকের চিন্তাধারার আলোকে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে অভ্যুদয় ঘটে অষ্টদশ শতাব্দীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামক দেশটির। মার্কিন নেতারা বিশ্বাস করেন মার্কিন রাষ্ট্র বিপ্লবের প্রথম সমর ধ্বনি রাজনৈতিক স্বাধীনতা। জর্জ ওয়াশিংটন, জন অ্যাডামস, জেফারসনের মতো প্রতিভাবান রাষ্ট্র নেতাদের দূরদৃষ্টিতে গড়ে ওঠেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ধ্বনিত হয়েছে “আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণ এই সংবিধান ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করেছি”। এখানে ব্যক্তির অবদানের চেয়ে জনগণের সংঘবদ্ধ প্রয়াস এবং সামাজিক শক্তিকে প্রাধান্যে রাখা হয়েছে। আমেরিকার ঐক্য, সংহতি এবং আর্থ-সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টি এবং সংরক্ষণে পরবর্তী সময়ে আব্রাহাম লিংকন, উড্রো উইলসনের মতো নেতার অবদান সর্বজন স্বীকৃত। গৃহযুদ্ধের কারণে বিভক্ত আমেরিকাকে ঐক্যবদ্ধ করার অঙ্গীকার নিয়ে প্রচণ্ড সাহসে আব্রাহাম লিংকন গেটিসবার্গের অতি সংক্ষিপ্ত ভাষণে দাসপ্রথা উচ্ছেদ ঘোষণা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “কোনো লোক অন্য কোনো লোকের প্রভু হবার যোগ্য হয়ে জন্ম নেয়নি”। অতঃপর বলেন, “সরকার জনগণের মধ্য হতে, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্যে”। পরবর্তী সময়ে উড্রো উইলসন বলেছিলেন, “আমেরিকার সৃষ্টি হয়েছিল মানব জাতিকে একতাবদ্ধ করবার জন্য। শুধু প্রীতি, সহানুভূতি এবং ন্যায়-বিচারের সাহায্যেই মানব জাতিকে একতাবদ্ধ করা যেতে পারে”। আমেরিকানদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, “আমেরিকার বোঝা উচিত, পৃথিবীতে আমেরিকাই একমাত্র দেশ যার ক্রমাগত বারবার পুনর্জন্মের অভিজ্ঞতা রয়েছে”। মূলতঃ আমেরিকার নানামুখি স্বপ্নের প্রসার ঘটেছে এ ধরনের শান্ত সংঘত দৃঢ় চিন্তা নেতৃত্বের বারংবার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে। ব্যাপক সংখ্যক নেতৃত্বের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের রাষ্ট্র নায়কোচিত সাচ্ছা দেশপ্রেমতাড়িত সিদ্ধান্ত প্রশংসা এবং অনুশীলনের দাবী রাখে। জনপ্রিয়তায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং জনগণের দাবী সন্তোষ তিনি তৃতীয় বারের জন্যে প্রেসিডেন্ট হতে রাজী হননি। বরং জনগণের উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক বক্তব্য রেখে তিনি বলেছিলেন, যদি একজন ব্যক্তিই বারবার রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান এবং ক্ষমতার পদে অধিষ্ঠিত হন তাহলে ক্ষমতার কেন্দ্রিকতা এবং লোভ জাতির বিকাশধারাকে অবরুদ্ধ করে দেবে। জাতি বঞ্চিত হবে

অধিকতর যোগ্য নেতার সেবা প্রাপ্তি থেকে। এতে নেতৃত্বের বিকাশের পরিবর্তে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব-সংঘাতের, সৃষ্টিশীলতার পরিবর্তে স্থবিরতা নেমে আসবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে এ ধরনের প্রত্যয় থাকা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে চারবার প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। এর পর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান সংশোধন করে কোন ব্যক্তিকে দু'বারের অধিক প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করা যাবে না বলে ঘোষণা দেয়। এটি মূলতঃ ক্ষমতার লোভ সংবরণের লক্ষ্যে অত্যন্ত যুগোপযোগী আইন হিসেবে রাজনৈতিক উন্নয়নে আস্থাশীল দেশগুলোতে সমাদৃত হয়েছে।

মার্কিন সংবিধানে মৌলিক অধিকার, জননিরাপত্তা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং প্রাধান্য, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, সংবিধানের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কাজের সীমাবদ্ধতা সর্বোপরি উপাধিদান এবং গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণসহ লিখিত, সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত শাসনতন্ত্র সর্বসাধারণের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন খ্রিস্টীয় ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেলে (ইঞ্জিল) হাত রেখে। নিরীশ্বরবাদিতা বিরুদ্ধে সাহিত্য করার লক্ষ্যে ডলারের শিরোনামে সংযুক্ত আছে ‘In god we trust’। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ স্ব স্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে সচেতনভাবে গড়ে উঠেছে। আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদের ভাণ্ডার এতো বিশাল যে, আমেরিকানদের মতে কোন উপনিবেশ তাকে তা দিতে পারত না। তারা আমেরিকাকে প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা আংশিক উন্নত মহাদেশ হিসেবে বিশ্বাস করে থাকে। তাদের অধিবাসীবৃন্দ কঠোর পরিশ্রমী। তাই বিদেশ থেকে অগণিত নর-নারী বন্যার স্রোতের মতো এ দেশে আসছে। আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তি জ্ঞানের কারণে আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশে পরিগণিত হয়েছে। এরপরেও দেশটিতে বর্ণবাদিতার মতো জঘন্য মানবতা বিরোধী ঘটনা অহরহ সংঘটিত হয়ে থাকে। বিশ্বজুড়ে পরাশক্তি হিসেবে অভিহিত আমেরিকা সম্পর্কে বিদেশে নেতিবাচক পরিচিতি রয়েছে দখলদারী পরাশক্তি হিসেবে। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতির সমালোচনা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক সামর্থ এবং প্রবৃদ্ধির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন পৃথিবী জুড়ে নিজস্ব প্রভাব বলয় সৃষ্টি করে চলেছে তখন এর পূর্বেই সমালোচনা করেছেন ম্যাসাচুসেটসের নির্বাচিত সিনেট সদস্য জর্জ ফ্রি সবি হোর এবং ইন্ডিয়ানা সিনেটর অ্যালবার্ট বেভারিজ। তারা প্রেসিডেন্ট ম্যাককিনলের উপনিবেশ নীতির তীব্র বিরোধিতা করে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে যে বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন তা ভিন্নমত পোষণ এবং প্রতিবাদ করার দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। সিনেটর হোর ম্যাককিনলের বিদেশনীতির প্রতিবাদ করে বলেছিলেন,

“পরদেশ শাসন ও অধিকারের প্রতীক স্বরূপ আমাদের পতাকা যখন তোমরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের উপর উত্তোলিত করবে, তখন তোমরা ‘স্বাধীনতা হলে’র উপর থেকে মার্কিন পতাকা নামিয়ে নিয়ো”। অর্থাৎ কর্তৃত্ববাদিতার পরিবর্তে ভিন্নমত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা আমেরিকান সমাজে উজ্জীবনী শক্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে।

আমেরিকান সরকার তাদের রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনাকে চলমান শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের ভাব অনুযায়ী রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারগুলো সংযুক্ত করে। সেগুলো হলো: ১. সততার সঙ্গে কাজ করার জন্যে জোতদার ও শ্রমিকদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভের অধিকার। ২. বৃদ্ধ বয়সে অভাবের তাড়না থেকে মুক্তি প্রত্যাশার অধিকার। ৩. নিজেদের বিচারমত সমিতি গঠনের এবং অবস্থার উন্নতির জন্য এই সব সমিতির সাহায্য গ্রহণে শ্রমিকদের অধিকার। ৪. ভাল স্থানে বাস করার অধিকার। ৫. জাতীয় সম্পদের উপযুক্ত অংশ লাভের অধিকার। উপর্যুক্ত অধিকারের নিশ্চয়তার কারণে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার অসংখ্য মানুষের মিছিল ছুটেছে দেশটির দিকে। একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হওয়া সত্ত্বেও মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানীদের একটি বড় অংশ মনে করেন যে, ১৯২৩ সাল থেকে যুদ্ধ ছাড়া আমেরিকা দেশের সকলকে কাজ দিতে পারেনি। তাদের বিশ্বাস আত্মরক্ষার মহা পরিকল্পনাও যুৎসই ভাবে আমেরিকা করতে পারেনি। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকা সরাসরি অংশ না নিলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এ যুদ্ধে মার্কিন পক্ষের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন জেনারেল আইসেন হাওয়ার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন আইসেন হাওয়ার। নির্বাচনী প্রচারণাকালে শিশু-কিশোর, তরুণরা তাঁকে ঘিরে ধরে স্লোগান তুলেছিলেন, Bring Back our Dady. আমাদের পিতাকে ফিরিয়ে দাও। যুদ্ধে নিহত সৈনিক পুত্র-কন্যাদের এই আন্দোলন সম্ভব হয়েছিল আমেরিকায়-যেহেতু সেখানে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ছিল।

বস্তুজগত সম্পর্কে সচেতন ও তৎপর আমেরিকা কার্যত আই এম এফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের সর্দার হিসেবে বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক। অস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানীতে সর্বশীর্ষে থাকা আমেরিকা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা নৌঘাঁটি গড়ে তুলে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নিজ ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে বিস্তৃত করে রেখেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অস্ত্র কলহ, জাতিগত সংঘর্ষ, মতাদর্শিক সংঘাতে জড়িয়ে পড়ার বিভিন্ন অভিযোগ আমেরিকার বিরুদ্ধে রয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া, লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং গৃহযুদ্ধের কারণে বিশ বিলিয়ন মানুষ নিহত হবার জন্যে ভিন্ন মতাদর্শের বিশ্বশক্তিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মার্কিন সংশ্লিষ্টতাকে দায়ী করেছে। মার্কিন বিরোধিতা অবাধে প্রচার চালিয়ে অনেক

নেতিবাচক বার্তা প্রদান করে আমেরিকা সম্পর্কে ব্যঙ্গ চিত্র জনমনে গেঁথে দিতে সচেষ্ট থাকে। একই সঙ্গে অস্বাভাবিক যৌনবিষয়ক ও খেলো চাকচিক্যময় চলচ্চিত্র এবং ব্যঙ্গাত্মক গ্রন্থাদির অজস্র প্রচারের ফলে বিদেশে আমেরিকার একটি রোগগ্রস্ত ও অপ্রকৃতিস্থ প্রতিরূপ বিশ্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির বাজারে চালু রয়েছে। এতদসত্ত্বেও মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর শাসকরা মার্কিন সামরিক ঘাটি নির্ভর হয়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পূঁজিবাদ সমাজতন্ত্রের চলমান সংঘাতে আমেরিকা পূঁজিবাদের প্রতিভূ হিসেবে সরকার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে। বিগত শতাব্দীর নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পতনের পর মার্কিন সমাজ বিজ্ঞানী ও নিরাপত্তা উপদেষ্টা প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের ‘সভ্যতার সংঘাত’ প্রকাশের পর ইসলামকে প্রধান আদর্শিক প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে কতিপয় উগ্রপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে ধূর্ত এবং ফন্দিবাজ গোয়েন্দা সংস্থার আনুকূল্যে মুসলিম দেশসমূহে সৃষ্টি করা হয় সশস্ত্র জঙ্গী সংগঠন। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার অভ্যন্তরে টুইন টাওয়ারে আক্রমণের জন্যে দায়ী করা হয় সৌদি নাগরিক ওসামা বিন লাদেনের নেতৃত্বাধীন আল কায়েদা গোষ্ঠীকে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ কোন রকম যথার্থ পর্যবেক্ষণ ব্যতীত ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন কথিত ত্রুসেড। ইউরোপ, আমেরিকা এবং তাদের মিত্রদেশগুলো এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইরাকের স্বৈরশাসক সাদ্দাম হোসেন, লিবিয়ার এক নায়ক মোয়াম্মার গাদ্দাফীর বিরুদ্ধে। যুদ্ধ ছড়িয়ে দেয় তালেবান শাসিত আফগানিস্তানে। রুশ-মার্কিন স্নায়ু যুদ্ধের স্থবিরতা বীভৎস রূপে প্রকাশ পায় ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, লেবাননে। পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম অধ্যুষিত দেশে বিভিন্ন গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের তৎপরতায় গড়ে ওঠে মুসলিম জঙ্গী আস্তানা। খ্রিস্টীয় ইউরোপ, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় মুসলমানরা জঙ্গী নামে আখ্যায়িত হতে থাকে। একই সঙ্গে মুসলিম দেশসমূহে ধর্মীয় গোষ্ঠীগত মতভিন্নতাকে উপলক্ষ্য করে চলতে থাকে জঙ্গী হামলা। আমেরিকার নেতৃত্বে প্রায় দু’যুগ ধরে চলমান সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধে মুসলিম দেশসমূহে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা শুধু অরক্ষিত হয়নি বরং দুর্দমনীয় সামন্ততান্ত্রিক শাসন প্রতিস্থাপিত হয়েছে।

প্রফেসর হান্টিংটনের ‘সভ্যতার সংঘাত’ ধারণা কার্যকর করতে গিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বাধীন কথিত সন্ত্রাস বিরোধী অব্যাহত যুদ্ধের শিকার হয় ইসলাম ধর্মের মৌলিক আবেদন এবং মর্মবাণী থেকে সহস্রাধিক বৎসর থেকে দূরে থাকা বেশিরভাগ পশ্চাত্পদ মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং তাদের মধ্যযুগীয় সামন্ত ধারণায় সীমাবদ্ধ নেতৃত্ব। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার সুযোগে ভেঙ্গে পড়া রাশিয়া কেজিবির সাবেক

প্রধান ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে সংঘটিত হতে থাকে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নেয়। রাশিয়ার এ ধরনের আকস্মিক সামরিক তৎপরতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ নীতিতে স্থবিরতা নিয়ে আসে। আমেরিকা নিজের কৌশল পরিবর্তনে অনেকাংশে বাধ্য হয়। ইউরোপে রাশিয়ার পুনরুত্থান এবং চীনের অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিশ্বব্যাপী উত্থান আমেরিকা সহ ন্যাটোর কর্ম-কৌশলে নতুন ধারণার সূত্রপাত ঘটায়।

রুশ বিপ্লবঃ সোভিয়েত ইউনিয়নঃ উত্থান-পতন এবং পুনরুত্থান চেষ্টা

সপ্তদশ শতকের শেষার্ধ্বে পিটার দি গ্রেটের মাধ্যমে রাশিয়ার উত্থান ঘটে। কঠোর পরিশ্রম, নিয়মানুবর্তিতা, আভিজাত্য পরিহার, স্বজাতিকে গঠনমূলক ধারায় গড়ে তোলার অদম্য বাসনা, কুসংস্কার, অপ্রয়োজনীয় রক্ষণশীলতা, সামুদ্রিক পথ সৃষ্টি, প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি রাশিয়াকে একটি তৎপর কর্মনিষ্ঠ দেশ হিসেবে অগ্রবর্তী করেন। এক পর্যায়ে পাশ্চাত্য দেশসমূহে দখলবাজি, তুরস্কের আধিপত্যমুক্ত ইউরোপ গঠনে তৎপরতা, ক্রিমিয়া, ইউক্রেনসহ বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার ও বজায় রাখার মাধ্যমে এক সময়ের পশ্চাত্পদ রাশিয়া ইউরোপের অন্যতম শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিগণিত হয়। পর্যায়ক্রমে ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার প্রথম নিকোলাসের উত্থান রুশ সাম্রাজ্যে ‘ঈশ্বর মনোনীত ব্যক্তি’ তত্ত্বের পুনরুত্থান ঘটে। জারদের স্বৈরনীতি শোষণ-দুঃশাসনে অতিষ্ঠ ভূমিদাস, কৃষক এবং নিম্নবর্গের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জারদের গোয়েন্দা পুলিশ রাশিয়া জুড়ে যে নৃশংস অত্যাচার ও হত্যা লীলার প্রসার ঘটিয়েছিল একপর্যায়ে প্রতিবাদের জবাব হিসেবে বিক্ষোভের ঘটে সর্বত্র বোমাবাজির। তারা দু’জন জারকে হত্যা করে গণনির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। মূলত রাশিয়ায় এভাবে শ্রেণি বিদ্বেষ ত্বরান্বিত হয়। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সময়কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলমান অবস্থায় ১৯১৭ সালে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নেতৃত্বে সম্পন্ন হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। রুশ জারতন্ত্র অবসানের পাশাপাশি “শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সর্বহারার এক নায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাশিয়া যেন উদ্দাম বেগে ছুটে চলা এক দেশ, কমিউনিস্ট বিরোধীদের নিধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সুশিক্ষিত সেনা কর্মকর্তাবিহীন সাধারণ সৈনিকদের মাধ্যমে গড়ে তোলা লাল ফৌজের দাপটের মুখে নির্মাণ করা হয় কোন প্রকার প্রতিবাদহীন এক সমাজ ‘ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র’। বিপ্লবের পর প্রতিবেশী দেশসমূহে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনে তৎপর হয়ে ওঠে রাশিয়া। হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুম্যানিয়া, পোল্যান্ড প্রভৃতি দেশে দ্রুত বিপ্লব সম্পন্ন হয়। পৃথিবীর নিপীড়িত মানুষের চোখ পড়ে রুশ বিপ্লবের দিকে।

রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গরীব নিঃস্ব মানুষের শাসন কর্তৃত্ব। অনেকেই বিশ্বাস করেছিল হয়তো বদলে যাবে পৃথিবীর যতোসব ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের কপাল। সর্বত্রই তরুণ যুব মানসে বিপ্লবের জোশ এবং ঝাঁক। ১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করলেন সোভিয়েত বিপ্লবের নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা। লেনিন পরবর্তী চার প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে বিপ্লবী সমর সভা প্রধান ট্রটস্কি এবং দলের প্রধান কর্মকর্তা স্ট্যালিনের প্রতিযোগিতা ছিল তীব্রতর। এক বছর পর অন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে সঙ্গে রেখে স্ট্যালিন ট্রটস্কিকে পদচ্যুত করেন। ট্রটস্কি আর দেশে থাকতে পারেননি। বিদেশে নির্বাসিত থাকা অবস্থায় ট্রটস্কি মেক্সিকোতে সোভিয়েত গুপ্তচরের হাতে নিহত হন। ‘দুনিয়ার মজদুর এক হও - লড়াই করো’ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন ট্রটস্কি। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৪ সালে লেনিনের মৃত্যুর পর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লব রণাঙ্গণীর সম্ভাবনা দ্রুত হ্রাস পায়। ১৯২৭ সালে অপর দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদচ্যুত করে স্ট্যালিন হয়ে ওঠেন মধ্যযুগীয় বর্বর দুঃশাসকদের মতো ক্ষমতাস্বত্ব নেতা। তাঁর সময়ে চারকোটির চেয়ে বেশি লোককে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। তাঁর কোন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রতিবাদ তো দূরের কথা ভিন্নমত পেশ করার সাহসও কারো ছিলনা। স্ট্যালিনের আমলে পৃথিবীর অনেক দেশে কমিউনিস্ট নেতা সংগঠকরা মাথার চুল এবং গোঁফ রাখতেন স্ট্যালিন স্টাইলে। সোভিয়েত রাশিয়ায় স্ট্যালিন শাসন চলেছে তিন দশক ধরে। এ সময়ে সংঘটিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। স্ট্যালিন সহজে কাউকে বিশ্বাস করতেন না, খুব কাছে কাউকে রাখতেন না। তবে তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত ছিলেন নিকিতা ক্রুশ্চেভ। ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের এতোই খয়ের খাঁ ছিলেন যে প্রতিটি হুকুম তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে পালন করতেন। স্ট্যালিন কে তিনি ‘বাবা’ সম্বোধন করতেন। পরম আনুগত্য প্রদর্শনের কারণে তিনি দেশ এবং দলের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতায় উন্নীত হন। স্বাভাবিকভাবে স্ট্যালিনের যাবতীয় কাজের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তিনি রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিযুক্ত হন। সর্বময় ক্ষমতা স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করার পর এক পর্যায়ে তিনি লেনিন টুম্বুে রক্ষিত তার ‘বাবা’ সম্বোধিত স্ট্যালিনের মৃতদেহ তুলে নিয়ে অমর্যাদাকরভাবে ভলগা নদীতে ফেলে দেন। কারণ স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর বর্বরতা এবং গণহত্যার বীভৎস চিত্র প্রকাশ হয়ে পড়লে নিজেকে রক্ষার তাগিদে এ ধরনের নির্দয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া ক্রুশ্চেভের উপায় ছিল না। রাজনৈতিক পরিতোষণের উল্টো চিত্র একান্ত ভক্তের নিকট কতো অবহেলায় নিগূহীত হয় এ ঘটনা তার প্রমাণ। একবার সোভিয়েত পার্লামেন্টে দীর্ঘ বক্তৃতায় ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের যথেষ্ট সমালোচনা করেন। স্ট্যালিনের একান্ত আনুগত্যের মুখ থেকে এ ধরনের তীর্যক সমালোচনা উপস্থিত সকলে নিশ্চুপ শুনে যাচ্ছেন। হঠাৎ পেছন থেকে মুখ লুকিয়ে এক

সদস্য বলে ওঠেন, 'আজ আপনি এতো কিছু বলেছেন, তখন আপনি কোথায় ছিলেন? প্রশ্ন শুনে হুঙ্কার দেন ক্রুশ্চেভ। জিজ্ঞেস করেন কে? কে বলল? সাহস থাকে তো দাঁড়িয়ে বলো? ক্রুশ্চেভের হুঙ্কারে পুরো সংসদ আতঙ্কগ্রস্ত। সংসদ জুড়ে কবরের নিস্তব্দ নীরবতা। সকলে মাথা নিচু হয়ে আছে। অতঃপর বিজয়ের হাসি দিয়ে ক্রুশ্চেভ বলেন, "এবার বুঝেছ! আমি কোথায় ছিলাম। আজ তুমি যেখানে আছ আমিও তখন সেখানে ছিলাম। এ ধরনের কঠিন এবং নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এগুতে থাকে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বাধীন হিসেবে সম্বোধিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে রাজনৈতিক অধিকার বিসর্জন দিয়েও সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। বরং এক পর্যায়ে ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী অগ্রাসন প্রতিরোধ কল্পে গড়ে তোলে বিশাল বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার-অস্ত্রনির্মাণ কারখানা। মাথাপিছু আয় এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তে এ ধরনের সমরাজ্ঞ তৈরী সাধারণ মানুষের ভাগ্য বদলে ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরং স্বীয় নিরাপত্তার নামে প্রতিবেশীসহ অনেক দেশে যুদ্ধ রপ্তানী করে পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমানা নিরাপদ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার নামে পররাজ্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার আর কোন পার্থক্য থাকেনি। মানুষের মৌলিক মানবাধিকার নেই। ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত প্রকাশ এবং চিন্তা ও সংগঠনের স্বাধীনতা নেই। একটি দল একটি মতবাদ-সরকারী দপ্তর এবং কর্মক্ষেত্রে একটি আওয়াজ-সমাজতন্ত্র। ভিন্নমত প্রকাশের স্বাধীনতা দলীয় ফোরামেও নেই। সুতরাং এক পর্যায়ে বিশাল এই দেশটি চিন্তা-চেতনা, মুক্তবুদ্ধি চর্চা, নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাসহ সকল ক্ষেত্রে স্থবিরতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। ফলে এ ধরনের কঠোর-কঠিন রূপান্তরহীন স্থবির সমাজ বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের প্রথম পাদে ভেঙ্গে পড়ে। গণবিপ্লবের মুখে শেষ কমিউনিস্ট শাসক গর্বাচেভ কতিপয় সংস্কার সাধন করে ভদ্রভাবে ক্ষমতা ত্যাগ করেন।

গর্বাচেভের পদত্যাগের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়। গড়ে উঠে নতুন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। দীর্ঘ সময় ধরে যে দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না, দেখা যায় সে দেশে গীর্জা-মসজিদ পানে ছুটে চলেছেন ধর্মপালনের লক্ষ্যে অসংখ্য মানুষ। রাস্তায় রাস্তায় স্ব স্ব ধর্মের নামে স্লোগান। গীর্জায় ঘন্টাধ্বনি, মসজিদে আযানের সুমধুর সুর। এ যেন এক নতুন রাশিয়া। কমিউনিস্ট পার্টির এক নায়কতান্ত্রিক সরকারের একটি মাত্র মতাদর্শ কেন্দ্রিক শাসনের অবসানের পরপর মুসলিম অধ্যুষিত তাসখন্দ, সমরখন্দ, বুখারা, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তানসহ সর্বত্র খুলে যায় মসজিদের দুয়ার, ইমাম বুখারী, হযরত বাহাউদ্দিন নক্সবন্দীসহ অসংখ্য

সাহাবা, অলি-দরবেশের মাজারের বন্ধ করা কপাট। সর্বাঙ্গিকবাদী সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির পরাজয় ঘটলেও কয়েক বছরের মধ্যে কেজিবি প্রধান ভ্লাদিমির পুতিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়। পরবর্তীতে ভ্লাদিমির পুতিন যোশেফ স্ট্যালিনের পথ ধরে নির্বাচনের নামে প্রহসন করে এগুতে থাকেন। ভ্লাদিমির পুতিন আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য অপসারণ এবং সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ভেঙ্গে দেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। ফলে ক্ষমতাসীন হয়ে তিনি ১৯১৭ সালের আলোকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পুনঃএকত্রীকরণে মনোনিবেশ করেন। রাশিয়ায় ভিন্নমত দমন এবং নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। পূর্ববৎ নিরঙ্কুশ একদলীয় চরম কর্তৃত্ববাদী শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও বিরোধী মত দমনে নির্মমতা হ্রাস পায়নি। তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং কর্মধারার প্রধান উপদেষ্টা দার্শনিক হিসেবে কর্মরত আছেন আলেকজান্ডার ডুরিন। ব্যক্তিগতভাবে চিন্তাশীল লেখক আলেকজান্ডার ডুরিন ইউনিয়ন অব সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পুনরুত্থান প্রয়াসী। তিনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎশক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার পুনরুত্থানকল্পে যে ডকট্রিন ঘোষণা করেছেন তাতে ১৯১৭-এর বিপ্লব পরবর্তী রাষ্ট্র কাঠামো পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে বর্তমানে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এবং স্বাধীন দেশগুলোর একত্রীকরণের মাধ্যমে শক্তিশালী রাশিয়া গঠনে বিশ্বাসী। ইউরোপে রাশিয়ার প্রতিবেশী দেশসমূহে কূটনৈতিক সামরিক প্রভাব বিস্তার করে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে রাজ্য, রাজনীতি এবং ধর্ম-বর্ণ বিভেদের প্রসার ঘটিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করা, বহু জাতি-ভাষা-সংস্কৃতির দেশ চীনের অভ্যন্তরে জাতিগত অস্থিরতা এবং দাঙ্গা অবস্থা চালু করা, জাপানের সীমান্তে সামরিক উপস্থিতি সৃষ্টি করে সর্বাবস্থায় হুমকি বজায় রাখা, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর অভ্যন্তরে অন্ত-ধর্মীয় অবিশ্বাস ও বিরোধ অব্যাহত রেখে অনৈক্য বজায় রাখা, ভারতকে নিজের প্রভাব বলয়ে অন্তর্ভুক্ত এবং অধীনস্ত রেখে পৃথিবী র একমাত্র রাষ্ট্র ও জাতিগত শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্নদ্রষ্টা উগ্র জাতীয়তাবাদী আলেকজান্ডার ডুরিন হলেন ভ্লাদিমির পুতিনের দার্শনিক নেতা। বর্তমান পৃথিবীর নানামুখি সংকট এবং সমস্যা অনুধাবনের প্রয়োজনে রাশিয়ার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাত্ত্বিক অনুশীলন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা রাখা আবশ্যিক। একই সঙ্গে ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে রাশিয়ার উত্থান এবং ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তারনীতি সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাত হওয়া দরকার। ইতোমধ্যে ভ্লাদিমির পুতিন 'রুশ বিশ্ব' বিলে সম্মতি দিয়ে পৃথিবীবাসীকে রাশিয়ার শক্তিমত্তা এবং জাতিগত সামর্থ জানান দিয়েছেন।

(চলবে)

শিশুতোষ: “মায়ের নির্দেশ: মিথ্যা বলবো না” ফারহানা আকতার চৌধুরী

ছোট বন্ধুরা, মহান আল্লাহর রহমতে আশা করি সকলে ভালো আছেন। গত সংখ্যায় আমরা মায়ের সেবায়ত্ত্ব করা সম্পর্কে উপমা দিয়ে আলোচনা করেছি। মা আমাদের জন্মদাত্রী, পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে জঠরে ধারণ করে অতিকষ্টে লালন করেছেন। মাতৃজঠর এক অন্য ভুবন। ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুর গোপন আবাস। সেখানে শিশুর অবস্থান সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ্ এবং ‘মা’ ব্যতীত কেউ অবহিত নন। অতঃপর ভূমিষ্ঠ হবার পর শিশু পৃথিবীর মুখ দেখে, সূর্যের আলো দেখে চমকে উঠে। শিশুর প্রথম খাবার মাতৃদুগ্ধ। ছয়মাস মায়ের বুকের দুধ ব্যতীত কোন প্রকার পানীয় এবং খাবার গ্রহণ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অর্থাৎ প্রথম ছয়মাস যেকোন শিশু পূর্ণমাত্রায় মাতৃদুগ্ধ নির্ভর। এক কথায় ‘মা’ হলেন প্রথম ছয়মাস আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্পূর্ণরূপে শিশুর লালন-পালনকর্তা। পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত ‘মা’ সন্তানের সেবা গুশ্রুসা যত্নের স্বার্থে নিজের ঘুম, বিশ্রাম আরাম আয়েশ বিসর্জন দিয়ে থাকেন। তাই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর পর মায়ের অবস্থান সর্বশীর্ষে। নবী-রাসুল, পীর-দরবেশ সকলেই যে কোন মানুষের প্রতি প্রথমতঃ মায়ের দোয়া নিতে আহ্বান করে থাকেন। আমাদের প্রিয় নবী (দ.) বলেছেন, “মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত”। মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)’র বহু বাণী এবং ঘটনা রয়েছে। ইসলাম ধর্ম প্রচারকালে প্রথমদিকে অনেক পরিবারে দেখা গেছে পিতা-মাতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেননি। অথচ সেই পরিবারের কোন এক সন্তান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। এ ধরনের অবস্থায় মাতা-পিতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক রাখা বিষয়ে প্রিয় নবী (দ.), ধর্ম সম্পর্কিত বিষয় ব্যতীত অন্য সকল ব্যাপারে মাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে বলেছেন। তাঁদের যথাযথ সেবা যত্নে মনোনিবেশ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্ম বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন আচরণে তাদের কোন প্রকার মনোকষ্ট দান থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী এটি হচ্ছে মায়ের প্রতি সন্তানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। সন্তান হিসেবে আমাদের উচিত মায়ের যেকোন

আদেশ-উপদেশ মেনে নিয়ে কাজ করা। মায়ের উপদেশ মেনে নিলে আল্লাহ্ খুশি হন এবং জীবনে সফলতা দান করেন।

এবার আপনাদেরকে একটি ঘটনা শুনাবো। আপনারা অনেকে বড়পীর হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)’র নাম শুনেছেন। তিনি ছিলেন আল্লাহর অন্যতম অলী-অর্থাৎ বন্ধু। তাঁর পিতার নাম হযরত সৈয়দ আবু সালাহ মুসা (রহ.), মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতিমা বিন্তে আবদুল্লাহ্ যায়ী। হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)’র ১০/১২ বৎসর বয়সে তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ আবু সালাহ মুসা (রহ.) ওফাত প্রাপ্ত হন। ফলে শৈশবেই পড়ালেখার পাশাপাশি গৃহকর্মের অনেক দায়িত্বও তাঁর উপর পতিত হয়। আঠারো বৎসর পর্যন্ত তিনি নিজে গৃহে অবস্থান করে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে থাকেন। তাঁর জ্ঞান হাসিলের স্পৃহা ছিল অসীম। গৃহকর্ম থেকে অবসর পেলেই তিনি সব সময় লেখাপড়া এবং জ্ঞান অর্জন সম্পর্কে চিন্তামগ্ন থাকতেন। এ ধরনের মানসিক অবস্থায় তিনি একদিন গৃহের ছাদে বসে আছেন। তখন হঠাৎ দেখতেন পেলেন একটি কাফেলা তৎকালীন পৃথিবীর অন্যতম শহর বাগদাদের দিকে যাচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনে বাগদাদ যাওয়ার ইচ্ছা জাগে। ছাদ থেকে নেমে তিনি মায়ের চরণতলে উপস্থিত হয়ে বেশি বেশি জ্ঞান অর্জনের জন্য বাগদাদ যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তখন তাঁর জননী নিতান্ত বৃদ্ধা, বয়স ৭৮ বৎসর। একমাত্র পুত্র হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) ব্যতীত তাঁর দেখাশোনা ও সেবা যত্নের জন্য অন্য কেউ নেই। তারপরেও পূণ্যবতী মাতা পরম আদরের সন্তানকে শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন এবং জমানার শ্রেষ্ঠ আউলিয়া-বুজুর্গদের সান্নিধ্য প্রাপ্তির জন্য বাগদাদ গমনের অনুমতি দেন। অর্থাৎ একমাত্র সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য ‘মা’ নিজের প্রয়োজন বিসর্জন দেন।

এদিকে জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজন অর্থ-কড়ির। মায়ের হাতে মাত্র আশিটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তা থেকে স্বীয় পুত্রকে তিনি চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে জামার বগলের নীচের অংশে সেলাই

করে দেন, যাতে কেউ এগুলোর সন্ধান না পায়। বিদায় মুহূর্তে পুত্রকে মহান আল্লাহর নিকট সোপর্দ করে বলেন, “কিয়ামত দিবসের পূর্বে হয়তো তোমার আমার মধ্যে আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। অতএব আমার একটি উপদেশ সব সময় মনে রাখবে এবং পালন করে চলবে—কখনো মিথ্যা বলবে না। বিপদে পড়লেও সব সময় সত্য কথা বলবে। সত্যবাদিতা মুক্তি দান করে এবং মিথ্যা ধ্বংস করে।

অতঃপর মায়ের কদমবুচি করে দোয়া নিয়ে হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) গৃহের কাছে অবস্থানরত কাফেলার সঙ্গে মিলিত হয়ে বাগদাদের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সে সময় পথে পথে সংঘবদ্ধ ডাকাত দল অবস্থান করত। কাফেলা বিশ্রামের জন্য থামলে অথবা চলার পথে ডাকাতরা কাফেলা আক্রমণ করে সবকিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত। এ ধরনের পরিবেশে তাঁদের কাফেলা আক্রান্ত হলে হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) একপাশে দাঁড়িয়ে সব কিছু লক্ষ্য করতে থাকেন। সাদাসিধা দেখে নিঃশ্ব ভেবে দস্যুরা তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। ইতোমধ্যে এক ডাকাত এসে তাঁর কাছে টাকা কড়ি আছে কিনা জিজ্ঞেস করে। কোন প্রকার ভীতি সংশয়-সংকোচ না করে হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) ডাকাতের উদ্দেশ্যে বলেন, “আমার নিকট চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা আছে”। ডাকাত বিষয়টি উপহাস মনে করে হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে নিয়ে ডাকাত সর্দারের নিকট উপস্থিত হয়। ডাকাতের কথা শুনে সর্দার হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে কথাটি সত্য কিনা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে। অতঃপর হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) পূর্ববৎ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে বগলের নীচে আস্তিনের অভ্যন্তরে সেলাই করে রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলোর বিষয় অবহিত করেন। আস্তিনের অভ্যন্তরে রাখা স্বর্ণমুদ্রাগুলো বের করা হলে সর্দার বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। দস্যু সর্দার হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.)-কে প্রশ্ন করে, স্বর্ণ মুদ্রাগুলো যেভাবে রাখা হয়েছে স্বীকার না করলে তা কেউ পেত না। মুদ্রা থাকার বিষয়টি কেন এই তরুণ স্বীকার করলেন তা ডাকাত সর্দার জানতে চায়। তখন হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) বলেন, “বিদায়কালে আমরা আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। সত্যে অবিচল থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। মায়ের উপদেশ আমি রক্ষা করেছি”। সব শুনে দস্যু সর্দারের মনে ভাবান্তর

ঘটে। সে ভাবল “একজন তরুণ নিজের মায়ের আদেশ পালন করতে গিয়ে লুকায়িত ধন ডাকাতের হাতে তুলে দিচ্ছে। অথচ আমি (ডাকাত সর্দার) অহরহ মহান স্রষ্টা আল্লাহর আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন করে চলেছি”। নিজেকে মহাপাপী ভেবে দস্যু সর্দার অনুশোচনার আশুনে জ্বলতে থাকে। নিতান্ত ছোট বালকের মতো ডাকাত সর্দার চিৎকার দিয়ে কেঁদে ওঠে। ডাকাত সর্দার তখন তরুণ তালেবুল এলেম হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)’র পবিত্র হস্তে নিজেকে সোপর্দ করে তওবা করে। অভাবনীয় দৃশ্য দেখে অন্যান্য ডাকাতরা দস্যু সর্দারের সঙ্গে একমত পোষণ করে। হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.)’র পবিত্র হস্ত স্পর্শ করে তারাও দস্যুবৃত্তি এবং যাবতীয় অপকর্ম পরিত্যাগের অঙ্গীকার করে। এ ধরনের সত্যবাদী অত্যন্ত মহৎ তরুণকে সঙ্গী করায় ডাকাতরা লুণ্ঠিত সকল মালামাল কাফেলা সদস্যদেরকে ফেরত দিয়ে বিদায় করে দেয়। মায়ের উপদেশ শুনে মিথ্যা পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে সত্যে অটল অবিচল থাকায় হযরত সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানী (ক.) শুধু নিজে মর্যাদা প্রাপ্ত হননি, কাফেলাকেও চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। একই সঙ্গে বিপদগামী ভ্রষ্ট পথে থেকে জীবিকা সন্ধানকারী একদল ডাকাতকেও সত্য পথের সন্ধান দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে সত্য তাপস এই মহান মনীষী বিশ্ব দরবারে “গাউসুল আযম” নামে সম্মানিত হয়েছেন। সুতরাং আমরা এখন থেকে মায়ের সং উপদেশসমূহ নিজের জীবনে অনুশীলন করতে সচেষ্ট থাকবো। আল্লাহ আমাদের সকলকে সততা অনুশীলনের তাওফিক দিন।

ছোট বন্ধুরা! আপনাদের জানার উদ্দেশ্যে বলা দরকার, উপরে আমরা কিছু শব্দ পড়েছি। যেমন,

১. (দ.)-এর মানে দরুদ পড়া অর্থাৎ সাল্লাল্লাহু তা’য়ালা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়া সাল্লাম। এ শব্দটি শুধুমাত্র রাসূলে পাকের পবিত্র নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়।

২. (ক.)-এর মানে কাদাসা সিররাহুল আযিয়।

৩. (রহ.)-এর মানে রহমতুল্লাহি আলাইহি। এই শব্দদুটো আল্লাহর প্রিয় বন্ধু আউলিয়া কেরামের নাম উচ্চারণ করার সময় সম্মান সূচকভাবে নিতে হয়।

অগণিত আশেক-ভক্তের মহীয়সী আশ্মাজান উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম
(রহ.)-এর প্রথম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারকগ্রন্থ 'আশ্মাজান' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে

উম্মুল আশেকীন হযরত মুনাওয়ারা বেগম (রহ.)

আশ্মাজান



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলার পবিত্র জমিনে প্রবর্তিত একমাত্র তুরিকা, তুরিকা-ই মাইজভাগুরীয়ার প্রবর্তক গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (ক.)'র প্রপৌত্র ও অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোকারা হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাগুরী (ক.)'র প্রথম পুত্র বিশ্বালি শাহানশাহ হযরত মাওলানা শাহসুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (ক.)'র ৩৪তম উরস শরিফ উপলক্ষে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরী (কঃ) ট্রাস্ট (SZHM Trust)-এর উদ্যোগে

৮ দিনব্যাপী কর্মসূচি ২০২২

তারিখ	অনুষ্ঠান এর বিষয়, সময় ও স্থান	ব্যবস্থাপনা
২ অক্টোবর ২০২২ রবিবার	হযরত গাউসুল আযম শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাগুরী (ক.)'র সম্মানিত খলিফাগণের আওলাদদের সাথে মতবিনিময় সভা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট।
৩ অক্টোবর ২০২২ সোমবার	ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাহানশাহ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাগুরীর (কঃ) জীবনী আলোচনা, র্যালি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানমালা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।
৪ অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার	“একুশ শতকে মুসলিম উম্মাহর চ্যালেঞ্জ সমূহ: সমাধান কোন পথে?” শীর্ষক সেমিনার -বিকাল: ৫টা বঙ্গবন্ধু হল, প্রেসক্লাব ভবন (৭ম তলা), জামালখান, চট্টগ্রাম।	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট।
৬ অক্টোবর ২০২২ বৃহস্পতিবার	ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ ও প্রতিষ্ঠান পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নীতি নৈতিকতা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় আলোচনা	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।
৬ অক্টোবর ২০২২ বৃহস্পতিবার	ফটিকছড়ি উপজেলার রেজিস্টার্ড এতিমখানায় ছাত্র-ছাত্রীদের একবেলা খাবার সরবরাহ	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট ও গাউসিয়া হক মন্জিল।
৭ অক্টোবর ২০২২ শুক্রবার	মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পর্যদ নিয়ন্ত্রণাধীন শাখা কমিটি সমূহের ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব এলাকার মসজিদে বাদ জুম'আ কুরআন তেলাওয়াত ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান	মাইজভাগুরী গাউসিয়া হক কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় পর্যদ।
০৯ অক্টোবর ২০২২ রবিবার	পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুল্লাহী (দ.) উপলক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ	এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট।
১১ অক্টোবর ২০২২ মঙ্গলবার	ইসলামের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সম্বলিত দুর্লভ চিত্র ও ভিডিও প্রদর্শনী, উপদেশমূলক, দিক-নির্দেশনা সম্বলিত প্রচার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, অস্থায়ী টয়লেটের ব্যবস্থা	গাউসিয়া হক মন্জিল ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট।
১২ অক্টোবর ২০২২ বুধবার	পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কর্মসূচি -সময়: ভোর ৬টা হযরত কেবলার রওজা শরিফ মাঠ হতে শান-ই আহমদীয়া গেইট পর্যন্ত	গাউসিয়া হক মন্জিল ও এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট।